Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের মুল্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোকছানা মোহাম্মাদ

রোলঃ 216021194

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের মুল্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোকছানা মোহাম্মাদ
রোলঃ 216021194

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের মুল্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোকছানা মোহাম্মাদ, আইডিঃ 216021194 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের মুল্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

31.05.24.

(স্বাক্ষর)

রোকছানা মোহাম্মাদ

আইডিঃ 216021194

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা 5
কোরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব 7
সময় বিনষ্টে অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহর তিরস্কার 12
ইবাদতে সময়ের মুল্য 13
হাদীসের আলোকে সময়ের গুরুত্ব 19
১.যৌবনে সময়ের মূল্য : 21
২.সুস্থতায় সময়ের মূল্য 22
৩.সচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব 24
৪.কুরআনে সময়ের মূল্য 25
৫.অবসরে সময়ের মূল্য 25
৬.দুনিয়াতে সময়ের মূল্য 26
সময়ের মূল্য নিয়ে বাংলা প্রবাদ 28
কাজ রেখে দেয়া ও বিলম্ব করা ধ্বংসের কারণ 33
যৌবনকালই কাজের শ্রেষ্ঠ সময় 36
রুটিন 38
ইবনে সুকাইনার কাছে সময়ের মুল্য 40
যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে তাইমিয়্যার সময়ের মূল্যায়ন 43
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 45
শরীরের যত্ন 47
হিসাব গ্রহণ 49
মর্যাদাবান সময় অনুসন্ধান 66
বুদ্ধিমানের সঞ্চয় 69
ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী-এর উপদেশ 72

ভুমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের মালিক মহান আল্লাহ তাআলার।অসংখ্য দরুদ ও সালাম শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি।

সময় আল্লাহ তাআলার এমন এক ব্যাপক নেয়ামত যা আমীর-গরীব, জ্ঞানী-মূর্খ ও ছোট-বড় সকলে সমান ভাবে লাভ করে থাকে।সময়ের দৃষ্টান্ত প্রখর রোদের মধ্যে রাখা বরফখণ্ডের মত,যা কাজে না লাগালেও গলে যাবেই। বর্তমানে মুসলিম সমাজ সাধারণ ভাবে সময় নষ্টের ব্যাধিতে আক্রান্ত।ইউরোপীয় সমাজে নানা দুর্বলতা থাকলেও তারা সময়ের মুল্য দেয়ায় ও তাদের জীবনকে একটি নিয়মের অধীনে চালাতে অভ্যস্ত।জ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে তাদের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ এটি।যে জাতি সময়ের মুল্য দিতে জানে তারা মরুভুমিকে ফুলবাগীচায় পরিণত করতে পারে,আকাশপথ জয় করতে পারে,মহাশুন্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং যুগের নেতৃত্বের পতাকা তাদের হাতে এসে যায়।পক্ষান্তরে যে জাতি সময়ের মুল্য দেয় না, সময়ই তাদেরকে বিনাশ করে ছাড়ে।এরূপ জাতি গোলামির জীবন যাপনে বাধ্য হয়, দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় সর্বোত্তম যুগ তথা প্রথম যুগের মুসলিমরা সময়ের সাথে কিরকম আচরন করতেন তা এখন আমাদের চোখের সামনে। তারা সময়কে খুব হিসাব-নিকাশ করে খরচ করতেন। টাকা-পয়সা,ধন-সম্পদের চেয়ে সময়কে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সময়ের প্রতিটি অংশকে কোনো না

কোনো উপকারী কাজে ব্যয় করতেন। তা হতে পারে জ্ঞান অর্জন অথবা কল্যাণমুখী কোনো কাজ।আবার হতে পারে আল্লাহর পথে জিহাদ, কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের ভিত নির্মাণ কিংবা মজবুত শিকড়বিশিষ্ট মাথা উঁচু করে রাখা এক সভ্যতার বিনির্মাণ।

আজ মুসলিমরা তাদের সময়গুলো অবহেলায় নষ্ট করে ফেলছে। অপচয় করে ফেলছে নিজেদের জীবনকে।তাদের নির্লিপ্ততা এখন নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। বনি আদমের কাফেলায় তাদের অবস্থান এখন পেছনের সারিতে।অথচ এক সময় তারাই সামনের সারিতে বসে বনি আদমের নেতৃত্ব দিত।পার্থিব বিবেচনায় তারা যেমন নিজেদের দুনিয়া সাজাতে পারে নি,তেমনি দ্বীনি বিবেচনায় আখিরাতের জন্যও কিছু করতে পারেনি। তারা দুকুলই হারিয়েছে...

আফসোস,যদি তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত! তাহলে দুনিয়ার সঙ্গে এমন আচরণ করত, যেন তাকে চিরকালই দুনিয়াতেই থাকতে হবে। আর আখিরাতের সঙ্গে এমন আচরণ করত, যেন আগামীকালই তার মৃত্যু হবে। কোরআনের এই আয়াতটি হতো তাদের স্লোগান—

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.)

“হে আমার রব!আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। সুরা বাকারা:২০১

কোরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

সময় আল্লাহর দান। সময়ের সমষ্টিই জীবন। জীবনে সফলতা, নিজেদের লক্ষ্যপানে পৌঁছতে এবং পরকালে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। লক্ষ্যহীন মানুষ সময় অপচয় করে। যাদের জীবনের লক্ষ্য আছে তারা সময়কে কাজে লাগায়।মানুষকে অত্যন্ত সীমিত সময় দেয়া হয়েছে।এ সময়ে সে যে বীজ বপন করবে, পরবর্তিতে তারই ফসল ঘরে তুলবে।

ফুলবাগিচায় প্রবেশ করে কে কি পরিমাণ ফুল আহরণ করবে, তা তারই ব্যাপার।যে যত শ্রম ব্যয় করবে,সে ততই ফল আহরণ করতে সক্ষম হবে।এটিই আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম। কোথাও এই নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম নেই।

"فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا"

“তুমি কখনই আল্লাহর রীতির পরিবর্তন দেখতে পাবে না।আর তুমি কখনই আল্লাহর রীতির পরিবর্তন দেখতে পাবে না।”

ভবিষ্যৎ হয়ে যায় বর্তমান আর বর্তমান হয়ে যায় অতীত।অত্যন্ত দ্রুত বেগে চলে এ ধারা।অথচ সময়ের এ গতিবেগ থামানো কিংবা কমানোর কোনো উপায়ই নেই মানুষের হাতে।

উস্তাদ আব্দুল ইলাহ আস-সায়েগ লিখেন, ‘সময় হচ্ছে কালের খণ্ডিত অংশ।প্রতিটি বস্তুই সময়ের বাহুডোরে আবদ্ধ। অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই সময়ের নিয়ন্ত্রণাধীন।

সুতরাং সময়ই হলো জীবনকাল। মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্র। তার জীবন ধারন,পরোপকার ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের উন্মুক্ত প্রান্তর। মানুষের এই মৌলিক নেয়ামতের প্রতি ইন্‌ঙ্গিত করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে।শুধু তাই নয়,অন্যান্য নেয়ামতের ওপর এটাকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষনা দেয়া হয়েছে। সময়ের মুল্য,সময়ের সুউচ্চ মর্যাদা ও এর বিশাল প্রভাবের নির্দেশনাসম্বলিত অনেক আয়াত রয়েছে কুরআন কারীমে।

এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার প্রতি এই বিশাল নেয়ামতের বর্ণনা দেয়েছেন,

"{الله الذي خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار* وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار* وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار*}"

আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে তা দ্বারা ফল-ফলাদি থেকে তোমাদের জন্য রিয্‌ক উৎপাদন করেন এবং তিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত

করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে তা চলাচল করে এবং নদীসমূহকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

তিনিই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন যা দিয়ে নানা প্রকার ফলফলাদি জন্মে তোমাদের জীবিকার জন্য। তিনি নৌযানগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, যাতে সেগুলো তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে চলাচল করে আর তিনি নদীগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।

তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে ওটা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।

সময়ের গুরুত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা কোরআনের বেশ কিছু সুরার শুরুতে বিভিন্ন সময়ের শপথ করেছেন।শপথ করেছেন রাত-দিন, সকাল-দুপুর ও ভোরের।

وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ﴿۱﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴿۲﴾

“কসম রাতের, যখন তা ঢেকে দেয়।”
কসম দিনের, যখন তা আলোকিত হয়।

وَ الَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿ۙ۳۳﴾ وَ الصُّبْحِ اِذَاۤ اَسْفَرَ ﴿ۙ۳۴﴾

রাতের কসম, যখন তা সরে চলে যায়,
প্রভাতের কসম, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।

فَلَآ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿۱۶﴾ وَ الَّيۡلِ وَ مَا وَسَقَ ﴿۱۷﴾

অতঃপর আমি কসম করছি পশ্চিম আকাশের লালিমার।
আর রাতের কসম এবং রাত যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার।

وَ الۡفَجۡرِ ۙ﴿۱﴾ وَ لَيَالٍ عَشۡرٍ ۙ﴿۲﴾

কসম ভোরবেলার।
কসম দশ রাতের।

وَ الضُّحٰی ۙ﴿۱﴾ وَ الَّيۡلِ اِذَا سَجٰی ۙ﴿۲﴾

কসম পূর্বাহ্নের,

কসম রাতের যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।

وَ الۡعَصۡرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ۙ﴿۲﴾

সময়ের কসম,
নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী রহঃ,তার তাফছীর গ্রন্থে সুরা আসরের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তার সারাংশ হচ্ছে, “আল্লাহ তাআলা সময়ের শপথ করেছেন।কারণ এই সময়ের মাঝেই সব ধরনের বিস্ময়কর বিষয় আবর্তিত হয় এবং অস্তিত্ব লাভ করে।জগতের সব কিছু এই সময়েই বেষ্টন করে আছে।মানুষের সুখ-দুঃখ,আরাম-আয়েশ, রোগ-শোক, ধন-সম্পদ ও অভাব-অনটন সবকিছু এই সময়ের মাঝেই প্রকাশিত।

অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَ جَعَلۡنَا الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ اٰیَتَیۡنِ فَمَحَوۡنَاۤ اٰیَۃَ الَّیۡلِ وَ جَعَلۡنَاۤ اٰیَۃَ النَّهَارِ مُبۡصِرَۃً لِّتَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِیۡنَ وَ الۡحِسَابَ ؕ وَ کُلَّ شَیۡءٍ فَصَّلۡنٰهُ تَفۡصِیۡلًا

আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন,

وَ مِنۡ اٰیٰتِهِ الَّیۡلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمۡسُ وَ الۡقَمَرُ ؕ لَا تَسۡجُدُوۡا لِلشَّمۡسِ وَ لَا لِلۡقَمَرِ وَ اسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ الَّذِیۡ خَلَقَهُنَّ اِنۡ کُنۡتُمۡ اِیَّاهُ تَعۡبُدُوۡنَ

আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ । তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর।

আল্লাহ তাআলার জন্য সমুদয় প্রশংসা। তিনিই স্থান-কালের মালিক।

اِنَّ عِدَّۃَ الشُّهُوۡرِ عِنۡدَ اللّٰهِ اثۡنَا عَشَرَ شَهۡرًا فِیۡ کِتٰبِ اللّٰهِ یَوۡمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ مِنۡهَاۤ اَرۡبَعَۃٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِکَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ ۬ۙ فَلَا تَظۡلِمُوۡا فِیۡهِنَّ اَنۡفُسَکُمۡ وَ قَاتِلُوا الۡمُشۡرِکِیۡنَ کَآفَّۃً کَمَا یُقَاتِلُوۡنَکُمۡ کَآفَّۃً ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۳۶﴾

নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোন যুলম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর

যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

সময় বিনষ্টে অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহর তিরস্কার

আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসী কাফেরদের ভৎসনা করেন,যখন তারা কুফুরির কারণে নিজেদের মুল্যবান জীবন নষ্ট করলো।আল্লাহর দেয়া মহামুল্যবান সময়কে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যয় করলো।লম্বা হায়াত পাওয়া সত্বেও কুফরি ও অবিশ্বাসী মতবাদ পরিত্যাগ করে ইমান তথা বিশ্বাসের আলোর সামিয়ানায় আশ্রয় নিলো না।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

وَ هُمۡ يَصۡطَرِخُوۡنَ فِيۡهَا ۚ رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَالِحًا غَيۡرَ الَّذِىۡ كُنَّا نَعۡمَلُ ؕ اَوَ لَمۡ نُعَمِّرۡكُمۡ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيۡهِ مَنۡ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيۡرُ ؕ فَذُوۡقُوۡا فَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ نَّصِيۡرٍ ﴿۳۷﴾

আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব’। (আল্লাহ বলবেন) ‘আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আযাব আস্বাদন কর, আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আল্লাহ তাআলা কেনো দির্ঘ জীবন দান করলেন?

উক্ত আয়াতের তাফছীরে হাফেয ইবনে কাছীর বলেন, ‘পৃথিবীতে যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেলো,সে যদি তা দ্বারা সত্যিকার অর্থে উপকৃত হতে না পারে,তবে তা অফলপ্রসূ হিসেবে বিবেচ্য।’

কাতাদাহ রহ, বলেন—

اعلموا أن طول العمر حجة،فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر

“স্বরণ রেখো! লম্বা হায়াত কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরুপ।তাই এমন লান্ঙ্চনাকর দীর্ঘ জীবন থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইবাদতে সময়ের মুল্য

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ‘ইবাদাত করবে।

ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ সময়কে মুল্যবান মনে করে প্রতিটি মিনিট ও সেকেণ্ড গণনায় রাখে। ইসলামে দিনরাতের পরিবর্তন,গ্রহসমূহের গতিধারা,কক্ষপথের বিবর্তন এবং দুনিয়ার কর্মযজ্ঞের সাথে সময়ের গুরুত্ব নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেয়। সেই সঙ্গে মানুষের চেতনা জাগরনের ওপর জোর দেয়।

যখন রাত বিদীর্ণ হয়ে সুবহে সাদিক তার চেহারাকে নেকাবমুক্ত করে,ঠিক তখন আল্লাহর পথে আহবানকারী দাঁড়িয়ে যায়,দিগন্ত বিস্তৃত দুনিয়ার বুকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করে।তখন একটা ডাক আসে,

“এসো নামাজের দিকে,এসে কল্যাণের দিকে,ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম।”এই ডাকে জিকিরে অভ্যস্ত জবান,শোকর আদায়কারী আত্মা এবং অজুর মাধ্যমে পবিত্র হাতগুলো সাড়া দেয়।তারা বলে—‘তুমি সত্য বলেছ,সত্যকে সমর্থন করেছ।’

যখন মধ্যাহ্নের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে,সূর্য আকাশের বুক থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ে, মানুষ দুনিয়াবি কাজ এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততায় ডুবে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে,সেই আহবানকারি আবার উঠে দাড়ায়। মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ, সালাত ও কল্যাণের দিকে ডাকে।মানুষকে তার রুটিন ওয়ার্ক থেকে টেনে বের করে আনে।দুনিয়ার অন্বেষণে ডুবে যাওয়া এবং বস্তুর পেছনে ছোটা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পায়।আর এটা হলো—জোহরের সালাত।

আবার যখন প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়া দিগুন হয়ে পড়ে, সূর্য অস্তগামী হয়,সেই আহবানকারী তৃতীয়বারের মত উঠে দাঁড়ায়।তখন আসরের সালাতের জন্য আহবান করে।

সূর্যের চাকতি যখন আত্মগোপনকরে,তার চেহারা যখন দিগন্ত থেকে গায়েব হয়ে যায়,তখন আল্লাহর দিকে আহবানকারি মুয়াজ্জিন চতুর্থবারের মতো আহ্বান করে।এটা দিনের শেষ এবং রাতের শুরুর সালাত—সালাতুল

মাগরিব।আর যখন পশ্চিম আকাশ থেকে লালিমা মুছে যায়, ঠিক তখন দিনের শেষ সালাত এশার জন্য আহবান ভেসে আসে।

আর এভাবেই একজন মুসলিম তার দিনের শুরুটা সালাত দিয়ে করে,শেষটাও সালাত দিয়ে করে।

ঠিক এভাবেই চিন্তা করলে দেখা যায়,শরীয়তের প্রতিটা হুকুম ইসলামের প্রতিটি কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় আদায়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।ঠিক যেমন প্রতিটি সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে আবার রোজার জন্য রয়েছে বছরের একটি মাস নির্দিষ্ট। যদি সে মাসে রোজা না রাখা হয়,তাহলে সারা জীবন রোজা রাখলেও তা পূরণ হবে না।যাকাত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পার হলে ওয়াজিব হয়।

হজ্জের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন রয়েছে।সেদিনটি যদি আদায় না করা হয়,তাহলে সারা বছর আরাফাতে অবস্থান করলেও হজ্জ আদায় হবে না।এসব রোকন ছাড়াও শরীয়তের অন্যান্য অধিকাংশ হুকুমের ক্ষেত্রেও নিয়ম ও শৃংখলা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰکُمۡ عَبَثًا وَّ اَنَّکُمۡ اِلَیۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱۵﴾

‘তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না’?

মানুষকে অনর্থক সময় ব্যয় করার ব্যাপারে ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।সময়কে অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ﴿۷﴾

অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হও।

وَ اِلٰی رَبِّکَ فَارْغَبْ ﴿۸﴾

আর তোমার রবের প্রতি আকৃষ্ট হও।

আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ) তার 'জামউল জাওয়াম' গ্রন্থে একটি হাদীস সংকলন করেছেন।নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—-প্রতিদিন প্রভাতে যখন সূর্য উদিত হয়,তখন দিন এ মর্মে ঘোষণা করে—-

من استطاع ان يعمل خيرًا فليعمله-فإني غير مكرر عليكم أبدًا.

'আজ যদি কেউ নেক আমল করতে পারে তাহলে সে তা করে নিক।কেননা আমি তোমাদের কাছে আর কখনই পুনরায় আসব না।'

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এই বলে দোয়া করতেন—-

"اللهم لا تدعنا في غمرة-ولا تأخذنا على غرة-ولا تجعلنا من الغافلين"

"হে আল্লাহ,আমাদেরকে কষ্টের মধ্যে ছেড়ে দিও না,আমাদেরকে উদাসীনতার সময়ে পাকড়াও করো না এবং আমাদেরকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

তিনি বলতেন,সময়ের চক্র যদিও বিস্ময়কর,কিন্তু মানুষের আলসেমী আরও বিস্ময়কর।মানুষের উচিত নিজ জীবনের সেই দিনটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা যা এমনভাবে অতীত হয়েছে যে, তাতে কোন নেক কাজ করা হয়নি। হযরত ওমর (রাঃ) এর একটি দোয়া ছিল—-

" اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات.."

“হে আল্লাহ,আমরা তোমার কাছে জীবনের মুহূর্তসমূহের কল্যাণ ও সময়ের বরকত প্রার্থনা করছি।”

তিনি বলতেন——আমার কাছে একেবারেই অসহ্য লাগে যখন কোন লোককে সম্পূর্ণ কর্মহীন দেখি যে, সে দ্বীনের কোন কাজেও লিপ্ত নেই,দুনিয়ার কোন কাজেও নেই।

হজরত আলী (রাঃ) বলতেন——

"الأيام صحائف أعماركم-فخلدوها صالح أعمالكم.."

“দিনসমূহ হলো তোমাদের জীবনের খাতা।এগুলোকো চিরস্থায়ীত্ব দান করো নেক কাজের মাধ্যমে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলতেন “আমি সেই দিনটির চেয়ে আর কোন কিছুর জন্য বেশী অনুতপ্ত হই না যা আমার জীবন থেকে কমে যায় অথচ সেদিনে আমার আমলে কোন সংযোজন হয়না।

ষাট বছর হায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অজুহাতের পথ রুদ্ধ

ইমাম বুখারী রহঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন——

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه ستين سنة.

‘রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন—— আল্লাহ তাআলা যার জীবনকাল ষাট বছর দীর্ঘায়িত করেছেন,তার জন্য তিনি রুদ্ধ করে দিয়েছেন অজুহাত পেশ করার পথ।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন——

من عمره الله تعالى ستين سنة ،فقد أعذر إليه في العمر.

‘আল্লাহ তাআলা যাকে ষাট বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছেন,জীবনকাল ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে তার অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন’

অর্থাৎ, তার কোনো আপত্তি কাজে আসবে না।ওজরের কোনো অবকাশই সে পাবে না।যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন।

জনৈক কবি বলেন——

وإن امرءاً قد سار ستين حجة
الى منهل من ورده لقريب

মানুষ যখন ষাট বছর বয়সে পৌছে
যায়, তখন সে পানির ঘাটের
একেবারে সন্নিকটে এসে পৌছে।
(অর্থাৎ, মৃত্যুর কাছাকাছি চলে আসে।)

সময়ের মুল্য,প্রিয় জীবনের গুরুত্ব,এর অনুভুতি ও গঠনমুলক জীবন অবলম্বন করার প্রতি নবী করিম (সাঃ) এর হাদীসসমূহেও বিভিন্ন পন্থা ও ভঙ্গিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

হাদীসের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

عَنْ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : " اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِك " (أخرجه الحاكم في المستدرك رقم

সময়ের মূল্য নিয়ে হাদিস :

প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কোন এক ব্যাক্তিকে রাসূল স: উপদেশ দেওয়ার সময় বললেন: তুমি পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দাও।

(১) বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনেকে গুরুত্ব দাও।

(২) অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও।

(৩) দারিদ্রতা আসার আগে তোমার সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও।

(৪) তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরতার প্রতি গুরুত্বারোপ করো।

(৫) এবং তোমার মৃত্যু আসার আগেই তোমার জীবনের গুরুত্ব দাও। মুসতাদরিক ৭৮৪৬

আল্লাহর রাসূল স: হাদীসের শুরুতে বলেছেন اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْس অর্থাৎ পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দাও। তিনি চাইলে এখানে احفظ অর্থাৎ সংরক্ষণ কর অথবা বলতে পারতেন اهتم অর্থাৎ গুরুত্ব দাও । যদিও হাদীসের শাব্দিক অর্থে اهتم তথা গুরুত্ব দাও অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত

রাসূল স: বুঝাতে চেয়েছেন উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় গনিমতের মতো যা মানুষ কোন রকম হিসেব ছাড়া লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে গনিমত তথা যুদ্ধলব্দ সম্পদ হিসেবে।

গনিমত শব্দের ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ অর্থাৎ: আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা কিছু তোমরা (গনীমত) লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রসূলের, রসূলের নিকটাত্মীয়, পিতৃহীন এতীম, দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য। (সূরা আনফাল: ৪১) । অত্র হাদীসে আল্লাহর রাসূল স: বুঝাতে চেয়েছেন যে গনিমতের সম্পদ যেমন মানুষ লুফে নেয়, সবচেয়ে দামিটাকে আগে প্রাধান্য দেয় তেমনি মানুষের উচিৎ তার জীবন চলার পথে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি বিষয়কে গনিমতের মত লুফে নেওয়া। মানুষ যেন এই পাঁচটি বিষয়কে আকর্ষণীয় সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। গনিমতের মাল যেমন পিছনে ফেলে আসলে আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা তেমনি উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গেলে তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

হাদীসে রাসূল স: মানুষের জীবনের মৌলিক পাঁচটি সময়কে উল্লেখ করে তার প্রতি গুরুত্বারোপের কথা উল্লেখ করেছেন।

১.যৌবনে সময়ের মূল্য :

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِك তোমার বার্ধক্য আসার আগেই তোমার যৌবনের গুরুত্ব দাও। অর্থাৎ যৌবন নামক যে গনিমত তোমাকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তুমি তার ফায়দা লুফে নাও কারণ তোমার বার্ধক্য তোমাকে আর তোমার যৌবনে ফিরে আসতে দিবেনা। তুমি তোমার যৌবনেই আল্লাহর আনুগত্যে সময় ব্যয় কর। আল্লাহর রাসূল স: যৌবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ এই বয়সেই মানুষ তার মনের মতো করে সবকিছু সাজিয়ে নিতে পারে। এই বয়স পার হয়ে গেলে সে তার জীবনের অসংখ্য চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

একজন বৃদ্ধ যেমন যুবকের মতো হাড্ডি চিবিয়ে খাওয়া দেখে আফসোস ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। ঠিক তেমনি যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যে এসে গেলে অসংখ্য অগনিত কাজের ইচ্ছা থাকা সত্তেও সে তা বাস্তবায়ণ করতে পারে না। কারণ তখন তার মন সায় দিলেও তার দেহ তাকে সায় দেয় না। তাই যৌবনের ইবাদতের প্রতি আল্লাহর রাসূল স: বলেছেন: سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلَّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فُيْ طَاعَةَ اللهِ ....رواه البخاري আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন সাত ব্যাক্তিকে তাঁর ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যাতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা । তার মধ্যে প্রথম হলো ন্যায় পরায়ণ বাদশা আর দ্বিতীয় হলো যে তার যৌবন আল্লাহর আনুগত্য তথা ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে... (বুখারী)।

অন্য হাদীসে রাসূল স: বলেন

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ عن عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا علم ـ ترمذي অর্থাৎ : কোন বনী আদম কেয়ামতের দিন তাঁর রবের

নিকট থেকে এক কদম ও নড়া ছড়াও পারবে না যথক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিবে একটি হলো সারাটা জীবন সে কোন পথে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে?.... (তিরমিজী)। আল্লাহর রাসূল স: অত্র হাদীসদ্বয়ে যৌবনের ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ যৌবনে মানুষ যেভাবে প্রতিটি ইবাদত যথাযথভাবে করতে পারে পড়ন্ত বয়সে তেমন করতে পারে না। যৌবনকালে চাইলে হিমালয় পর্বত জয় করা সম্ভব কিন্তু বার্ধক্যে হিমালয় পর্বততো দূরের কথা সমতলে হাঁটতেও হাঁপিয়ে ওঠে। আজ আমাদের সমাজে যুব সমাজকে টার্গেট করে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের শয়তানী কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছে।

২.সুস্থতায় সময়ের মূল্য

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ صِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ তোমার অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও। সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিশাল নেয়ামত। সুস্থ অবস্থায় একজন মানুষ যেভাবে ইবাদত করতে পারে অসুস্থ অবস্থায় সেভাবে পারে না। শুধু ইবাদতই নয়, মানুষ তার কোন কাজ-কর্মই সঠিকভাবে করতে পারে না। কখনো কখনো মানুষ তার প্রচন্ড অসুস্থতায় আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে। মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন সে এ সুস্থতাকে তেমন মূল্যায়ণ করে না। আর যখনই সে কোন রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে ।সে মনে করে তার রোগটাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন রোগ । তারা যন্ত্রনাই কঠিন যন্ত্রনা। অথচ সুস্থ থাকা অবস্থায় সে একে তেমন কোন রোগই মনে করতো না। এই কারণেই রাসূল স: বলেছেন: نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ (رواه البخاري) মানুষের মধ্যে অধিকাংশ

মানুষ দুটি নেয়ামতের খুব অবহেলা করে- একটি হলো সুস্থতা অপরটি হলো অবসরতা (বুখারী)।

এই দু'টি বিষয়ে অনেক মানুষ প্রতারিত অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আছে।কতেক আলেমের মতে—-যেসব বস্তু মানুষ ভোগ করে,সেগুলোকে নেয়ামত বলা হয়।আর ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো জিনিস অধিক বা দ্বিগুণ দামে কিনলে অথবা ন্যায্য মুল্যের কমে বিক্রি করে প্রতারিত হলে الغبن শব্দটি ব্যবহার করা হয়।সুতরাং যে শারীরিকভাবে সুস্থ এবং বিশেষ কোনো কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়া সত্বেও পরকালীন কল্যাণে তেমন কিছু করলো না,বা করতে পারলোনা সেও ঠিক বেচা-কেনায় প্রতারিত ব্যক্তির মতই প্রতারিত হলো।এর মানে হচ্ছে—-বেশিরভাগ মানুষই সুস্থ ও অবসর সময় থেকে উপকৃত হতে পারে না;বরং তা অনর্থক বিনষ্ট করে ফেলে।এতে করে সর্বতভাবে তার জন্য বিপদের কারন হয়ে দাড়ায়।অন্যদিকে, যারা সুস্থতা ও অবসরকে কাজে লাগাতে পারে,তাদের জন্য তা হয়ে উঠে সোনায় সোহাগা তথা পরম কল্যাণকর।

ইমাম ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন, কখনো মানুষ সুস্থ থাকে,কিন্তু অবসর থাকে না।ব্যস্ত থাকে জীবিকা নির্বাহে।আবার কখনো সে অবসর থাকে,কিন্তু সুস্থ থাকে না।অসুস্থতায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে।যদি কখনো তার মাঝে উভয়টি একত্র হয়,কিন্তু আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে অলসতা তার উপর তেড়ে বসে,তাহলে হয়ে যায় প্রতারিত।

অসুস্থতার আগে সুস্থতার গুরুত্ব ঐ পরীক্ষার্থীই সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারবে যে কিনা পরীক্ষার আগের দিন পড়বে বলে তার সকল পড়া জমা করে রেখে ছিল কিন্তু কোন কারণে সে পরীক্ষার আগের দিন এতো বেশি অসুস্থ হলো যে পড়াতো দুরের কথা পড়ার টেবিলেও বসতে পারেনি। তখন তার কাছে মনে হবে তার সুস্থতার সময়েই সে পড়াটা পড়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হতো। এজন্যই বলা হয় "সুস্থতা স্বাস্থের মাথার উপর এমন একটা

মুকুট যা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ দেখতে পায়না"। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার সুস্থতাকে গুরুত্ব দিয়ে সে তার রবের দেওয়া সকল দায়িত্ব পালন করে নেওয়া। কারণ সুস্থ অবস্থায় ইবাদতের যে পরিপূর্ণতা আসে তা অসুস্থ অবস্থায় আসে না।

৩.সচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِك অর্থাৎ তোমার দারিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও। একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ধনী কখনই তার ভবিষ্যত সম্পর্কে উদাসীন থাকে না। সে তার আগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার অর্জিত সম্পত্তির পুরোটাই ব্যয় না করে কিছু কিছু করে সে সঞ্চয় করে রাখে। অথবা তার অতীব প্রয়োজনীয় কাজ গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে তার সচ্ছলতার সময় সম্পন্ন করে ফেলে। ঠিক তেমনি একজন সচেতন মুমিন মুসলিমও তার সচ্ছলতার সময় সে তার সম্পত্তি থেকে আল্লাহর রাহে দান করে,গরীব অসহায় মানুষের প্রতি দয়া করে তার মৌলিক ইবাদত তথা যকাত আদায় করে, হজ্জ পালন করে। বুদ্ধিমান সে মহান আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিশেষ অফার গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: **مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم** (অর্থাৎ আল্লাহর পথে যারা তাদের সম্পদ থেকে দান করে তাদের দানের উদাহরণ হলো একটি বীজের মতো যা বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষ থেকে বের হয় আরো একশত দানা। তাছাড়া আল্লাহ

তায়ালা যাকে চান তাকে দ্বিগুন করে দেন। আর আল্লাহ তায়ালা বিশাল ও মহাজ্ঞানী (সূরা আল বাকারা: ২৬১)।

৪.কুরআনে সময়ের মূল্য

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ- وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ- অর্থাৎ :আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তখন আল্লাহ প্রতিত্তরে বলবেন) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (সুরা মুনাফিকুন: ১০-১১)। অতএব সচেতন ও সচ্ছল মুমিনের উচিৎ তার মৃত্যু বা অসচ্ছলতা আসার আগেই সে আল্লাহর পথে তার সম্পদ দান করবে।

৫.অবসরে সময়ের মূল্য

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِك অর্থাৎ তুমি তোমার ব্যস্ততা আসার আগে তোমার অবসরতাকে গুরুত্ব দাও। কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি

অবহেলা করে তার অবসরতাকে। অবসর সময়তে মানুষ বেশি আল্লাহর থেকে বেশি গাফেল থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার রাসূল কে লক্ষ করে বলেন: فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب (কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও। (সুরা ইনশিরাহ: ৭-৮)।

সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ তার সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো এং অবসরতাকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে ব্যয় করা। কারণ তাকে অযথা অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে । তাদেরকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবেনা? (সূরা আল-মুমিনূন: ১১৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: أَيَحسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُترَكَ سُدَى মানুষকে ধারণা করে নিয়েছে তাকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে। (সূরা কেয়ামাহ : ৩৬)

৬.দুনিয়াতে সময়ের মূল্য

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حياتَكَ قَبْلَ مَوْتِك অর্থাৎ তোমর মৃত্যু আসার আগে তুমি তোমার জীবনকে গুরুত্ব দাও। কেননা যখন মৃত্যুর দূত আসবে তখন কোন অযর আপত্তিই মানুষকে তার মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلآ

أَخَّرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ، وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَآ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون অর্থাৎ: আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।(সুরা মুনাফিকুন: ১০-১১)

একদা রাসুলাল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে।অতঃপর আবার জিজ্ঞাসা করা হলো,দুর্ভাগা কারা? দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে অথবা আমলহীন অতিবাহিত করেছে।(তিরমিজী—২৩২৯)

যখন মানুষের নিকট মৃত্যু উপস্থিত তখন দুনিয়াতে আল্লাহকে অস্বীকারকারীগন আল্লাহর কাছে দুনিয়ার আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার সুযোগ প্রার্থনা করবে। নষ্ট করে ফেলা সময়কে কাজে লাগানের জন্য। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা প্রত্যখ্যান করবেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُون অর্থাৎ যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ হে আমার পালণকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি,

যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা আল মুমিনূন: ৯৯-১০০)।

সময়ের মূল্য নিয়ে বাংলা প্রবাদ

বাংলায় প্রবাদ আছে “সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়”। কেয়ামতের মাঠে যখন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে তখন অবিশ্বাসীগণ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাবে তাদের আবার দুনিয়াতে পাঠাবে, তারা দুনিয়ায় এসে সৎকাজ করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন।

আল্লাহ তায়ালা তাদের কথাকে কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন وَلَوْ تَرَىٰ
َإِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُون
অর্থাৎ (হে রাসূল) যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা নত করে বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী (সূরা আস সাজদাহ : ১২) ।

সূতরাং কোন বিবেকবানের উচিৎ নয় সকালে তার কাজের জন্য বিকেলের অপেক্ষা করা। কারণ হতে পারে আজকের সকালটিই তার জন্য শেষ সকাল আর হয়তো বিকাল খুঁজে পাবেনা। হযরত আলী রা: বলেন: الناسُ نِيَامٌ فإِذا مَاتُوا انتَبَهُوا : অধিকাংশ মানুষ তার মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন, যখনই তার মৃত্যু

আসে তখন সে হাহুতাস করতে করতে লজ্জিত হয়। সে ভাবে আগামী কাল সে ভালো কাজ করবে। অথবা আজকের পর থেকে সে আর মন্দ কাজ করবে না। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় হলো তার মৃত্যু হঠাৎ এসে তার সকল পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়।

এসব কথার সার নির্যাস হচ্ছে—-দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্য ক্ষেত্র।এখানে যা উৎপন্ন ও ব্যবসা করা হবে তার ফসল ও লাভ পাওয়া যাবে আখেরাতে।অতএব, যে ব্যক্তি সুস্থতা ও অবসরকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগিতে ব্যবহার করবে,সে ইর্ষার পাত্র হয়ে উঠবে।আর যে ব্যক্তি তা ব্যবহার করবে আল্লাহর নাফরমানিতে সে হয়ে উঠবে প্রতারিত।কেননা অবসরের পর ব্যস্ততা আসবে। আর সুস্থতার পর আসবে অসুস্থতা। আর যদি অন্য কোনো অসুস্থতা নাও দেখা দেয়,তথাপি তুমি বৃদ্ধ তো হবেই—— যা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দুয়ারে।

সময়ই জীবন

ইমাম গাযালী রহঃ বলেন,'সময়ই আপনার জীবনকাল।আর জীবনকাল হচ্ছে আপনার মূলধন।এতেই আপনার ব্যবসা।এর মাধ্যমেই আপনাকে পৌছতে হবে আল্লাহর কাছে,চিরন্তন মনজিলে।সুতরাং আপনার প্রতিটা নিঃশ্বাসই মহামুল্যবান। এর কোনো তুলনা নেই।ফুরিয়ে গেলে তা আর কখনো ফিরে আসবে না।তাই আপনি ওই বোকার মত আচরণ করবেন না,প্রতিদিন যার সম্পদ বাড়তে থাকে,তা দিয়ে সে প্রাণসংহারক ও ক্ষতিকর কাজে ব্যয়

করে।এমতাবস্থায় ওই অধিক সম্পদের কী সার্থকতা,যা বয়ে আনে কেবল জীবনের ক্ষয়!? সুতরাং এলম আমলের আধিক্য ছাড়া খুশি হবার কিছুই নেই। কেননা এদুটিই আপনাকে কবরে সঙ্গ দিবে।যখন আপনার পরিবার-পরিজন, ধন- সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধব আপনার বিরোধিতা করবে।

এ ব্যাপারে বিখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফাতাহ আহমাদ ইবনে মুতাররিফ আসকালানী রহঃ(মৃত্যু : ৪১৩ হিজরী) মানুষের অনায়েসে উম্মাদের মতো সময় নষ্ট করা এবং বিচক্ষণতার সাথে পরিমাপ করে সম্পদ ব্যয় করার মাঝে তুলনা করে তাদের এই নীতির সমালোচনা করে আবৃত্তি করেছেন——

إذا ينفق في الدنيا مجازفة.......

والمال ينفق فيها بالموازين.......

‘এই জগতে সময় খরচ করা হয় বেহিসেবি হয়ে,
অথচ সম্পদ মেপে মেপে খরচ করা হয়।’

আরিফ ইবনে আতাউল্লাহ আল-ইসকান্দারী রহঃ বলেন, ‘আপনার নিঃশ্বাসকে আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যয় করবেন না।নিঃশ্বাসের ক্ষুদ্রতার দিকে দৃষ্টি দিবেন না;বরং তার ওজনের দিকে দৃষ্টি দিন এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কতো মুল্যবান নেয়ামত দান করেছেন, সেদিকে নজর দিন। শ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে মহামুল্যবান রত্ন।আপনি কি কখনো কাউকে গোবরের স্তুপে মুল্যবান রত্ন নিক্ষেপ করতে দেখেছেন? তিনি তার হিকাম গ্রন্থে বলেছেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফাতাহ আল-বুসতী বলেন———

أنفسنا اقوات أوقاتنا......

والقوت لا بد له من نفاد.....

‘আমাদের নিঃশ্বাসগুলো হচ্ছে আমাদের সময়ের শক্তি। আর শক্তির ক্ষয় অবশ্যম্ভী।এ কারণেই বলা হয়ে থাকে——‘সময় হচ্ছে তরবারি তুল্য।হয়তো তুমি তা কেটে ফেলবে,নতুবা তোমাকে সে কেটে ফেলবে।

ইবনে আবী জামরাহ বলেন—-‘এ কথার অর্থ হলো,আপনি সময়কে কাজ দ্বারা কেটে ফেলুন।যেনো সে আপনাকে কাজের আশ্বাস দিয়ে বেকার রাখতে না পারে। এছাড়া এ বাক্যের এ অর্থও করা যায়,যদি তুমি সময়কে কাজে লাগানো এবং সময় থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সজাগ না হও তাহলে তুমি হবে তরবারির আঘাতের সম্মুখীন ব্যক্তির ন্যায়। কেননা সে যদি তা থেকে আত্মরক্ষা এবং তা প্রতিহত করার জন্য সজাগ না হয় তাহলে তরবারির আঘাত তাকে শেষ করে দেবে।যারা সময় নষ্ট করে তারা বলে থাকে—-এতটুকু সময় কি-ইবা করা যায়? কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা উচিত,সময়কে যারা কাজে লাগিয়েছে,তারা এই স্বল্প সময়েই আবিষ্কারক হয়েছে,দার্শনিক হয়েছে, বুযুর্গানে দ্বীন ও অলিআল্লাহ হয়েছেন।দ্বীন দুনিয়ার বাদশাহ হয়েছেন।পক্ষান্তরে যত দরিদ্র ও অভাবী লোক দেখা যায় এরা হলো তারাই যারা শৈশবে অযথা সময় নষ্ট করেছে।শৈশবের ভিত্তিমূলের একটি বাঁকা ইট তার জীবনের গোটা ইমারতকে বাঁকা করে দিয়েছে।অহেতুক সময় ব্যয় করার অর্থ একটি সতেজ লকলকে গাছের কয়েকটি ডাল কেটে ফেলা। অযথা কাজ থেকে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে বাঁচিয়ে একজন সাধারণ মানুষও বিজ্ঞানের কোনো একটি শাখা পুরো আয়ত্ত করতে পারে।প্রতিদিন একঘণ্টা ব্যয় করে একজন অজ্ঞ মূর্খলোকও দশ বছর পরে এক পর্যায়ের অভিজ্ঞ আলেম হয়ে যেতে পারে।প্রতিদিন একঘণ্টা ব্যয় করে একজন স্বাভাবিক

মেধার ছাত্রও কোনো বইয়ের গড়ে বিশ পৃষ্ঠা ভালোভাবে বুঝে পাঠ করতে পারে।এভাবে সারা বছর প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠা পাঠ করে ফেলতে পারে। মোট কথা প্রতিদিন মাত্র এক ঘণ্টা ব্যয় করার ফলে একজন মানুষ তার পশুসুলভ জীবনকে পরিণত করতে পারে আনন্দময় কর্মক্ষম মানবিক জীবনে।

‘কাল’ শব্দটি এক বড় প্রতারণা

সময় নষ্ট করার জন্য মানুষকে অনুশোচনা ও লজ্জা থেকে রক্ষা করে ‘কাল’ শব্দটি।বলা হয়ে থাকে—- মানুষের গোনাহ,নির্বুদ্ধিতা,ওয়াদাভঙ্গ,আশাভঙ্গ, অবহেলা,বেপরোয়া হওয়া ও জীবন বরবাদ করার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী হলো ‘কাল’ শব্দটি।কেননা আগামীকাল কখনই আসে না।সেই ‘কাল’ হয়তো কেয়ামতের দিন হয়, নইলে অতীতকাল হয়ে যায়।অতীত ‘কাল’কে তো আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না।আর কেয়ামতের ‘কাল’তো অনেক দূর।এ দু’ধরণের কাল-কে আমরা আজকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে পারি না।সময় যখন একবার মরে গেছে তখন তাকে পড়ে থাকতে দাও।এখন তার জন্য আর কি করার আছে,কবরের উপর গিয়ে অশ্রু বহানে ছাড়া?মানুষের উচিত ‘আজ’—এর দিকে ফিরে আসা। কিন্তু মানুষ এদিকে ফিরে আসে না এবং কার্যতঃ আগামীকালকে আজ করে না। “প্রতিরাতে বলি এ কাজটি আগামীকাল করব।অতঃপর আগামীকাল এলে আজকে আগামীকাল করি।”

জ্ঞানীদের খাতায় 'কাল' কোনো শব্দ পাওয়া যায় না।এতো হলো শিশুদের মন ভোলানো শব্দ যে, আগামীকাল ওই খেলনাটি এনে দেবো। এ শব্দ তারাই ব্যবহার করে থাকে,যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কল্পনার পোলাও রান্না করে আর সারাদিন আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখে।

কাজ রেখে দেয়া ও বিলম্ব করা ধ্বংসের কারণ

দেখুন! কিভাবে সময়ের অপচয়ের কারনে এবং কাজের ক্ষেত্রে ওজর পেশ করার কারণে একটি দেশ ধ্বংস হয়ে যায়! উসামা ইবনে মুনকিয প্রণীত 'লুবাবুল আদাব' গ্রন্থে আছে,এক বাদশাহর হাত থেকে তার দেশটি হাতছাড়া হয়ে গেলো। বাদশাহকে জিজ্ঞেস করা হলো— কী কারণে আপনার এই পরিণতি?জবাবে বাদশাহ বলেন— আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয়া এবং কাজের বেলায় ওজর পেশ করার কারণে।'

কবি বলেন——

تشاغلت بالدنيا ونمت مفرطاً

وفي شغلي أو نومتي سرق العمر

'জাগতিক কাজে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম।ঘুমিয়ে ছিলাম অবহেলায়।এই ব্যতিব্যস্ততা আর ঘুমের ঘোরেই চুরি হয়ে গেল আমার জীবন।'

হজরত উমর (রাঃ) হজরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এর কাছে পত্র লিখেন—-পর সমাচার,নিশ্চয় কাজের শক্তি হচ্ছে সেই কাজটি আগামীকালের

জন্য রেখে না দিয়ে যথা সময়ে সমপন্ন করার মধ্যে।আপনি যদি এমনটি করেন,তাহলে আপনি সুষ্ঠুভাবে কাজটি সমপন্ন করতে পারবেন।

আরিফ ইবনে আতাউল্লাহ আস-সিকান্দারী তার 'হিকাম' গ্রন্থে বলেছেন— কাজসমূহ অবসর সময়ের জন্য রেখে দেয়া আত্মপ্রতারণার নামান্তর।

শৈশবের জ্ঞান অত্যন্ত কার্যকর

হাফেয আবুবকর খতীবে বাগদাদী রহঃ তার 'আল-ফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ' গ্রন্থে 'শৈশবে বিদ্যার্জন ও যৌবনকাল' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেন— হযরত আব্বাস রা. হতে বর্ণিত,আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী ও রাসূল প্রেরণ করেননি যিনি যুবক ছিলেন না।কোনো আলেমকে যৌবনকালের মত কার্যকর ইলম অন্য সময় দেয়া হয় না।মূসা ইবনে আলী ইবনে হুসাইন হতে বর্ণনা করেন লুকমান হাকীম তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন——হে পুত্র! ছোট থাকতেই জ্ঞানর্জনে সচেষ্ট হও। কেননা, বৃদ্ধদের জন্য জ্ঞানর্জন কষ্টকর।

হিশাম ইবনে ওরওয়া বলেছেন——আমার পিতা বলতেন,'আমরা এক সময় ছোট ছিলাম।বর্তমানে আমরা বড়ো।তোমরা এখন ছোটো।তোমরাও এক সময় বড়ো হয়ে যাবে। সুতরাং জ্ঞানর্জন করো।এর দ্বারা তোমরা জাতির নেতৃত্ব দিতে পারবে।জাতি তোমাদের প্রতি মুখাপেক্ষি হবে।'

আবুবকর খতীবে বাগদাদী বলেন,তারুণ্যের সময়, জীবনের শুরুতে সম্পূর্ণ ঝামেলা মুক্ত থেকে পূর্ণাঙ্গ মেধা মননের প্রশান্তি নিয়ে ফিকাহ অর্জন ও আয়ত্তকরণের দ্বারা ফিকাহ অন্তরে গেঁথে যায়।এর দ্বারা সুফল ভোগ করা যায়। আল্লাহর তাওফীকে তাতে বরকতও হয়।অপরদিকে,যদি অবহেলা করে বার্ধক্যে নিয়ে যাওয়া হয়,যখন অভ্যাস প্রকৃতির বিবর্তন ঘটে, দৈহিক শক্তি হ্রাস পায়,তখন অবস্থা এমন দাঁড়ায়—-

কবির ভাষায়——

إذا أنت اعياك التعلم ناشئاً

فمطلبه شيخاً عليك شديد

‘যৌবনে যদি তুমি শিক্ষর্জন করতে না পারো,তাহলে বৃদ্ধাবস্থায় তা তোমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

হাসান বসরী রহ. বলেন—-ছোটবেলায় মুখস্থ করা পাথরে অন্কিত বস্তুর ন্যায়।তিনি আরও বলেছেন—ছোটবেলায় শিক্ষার্জন করা পাথরে অন্কিত বস্তুর ন্যায়।

আলকামা বলতেন,আমি শৈশবে যা শিখেছি,তা এখন আমার মনে হচ্ছে,আমার সামনে যেনো সেটি একটি কাগজের মতো স্পষ্ঠ।

মা’মার বলেন, আমি যখন কাতাদার মজলিশে বসি, তখন আমার বয়স ছিলো চৌদ্দ।তখন তাঁর কাছে আমি যা কিছু শিখেছিলাম আজ এই শেষ বয়সেও মনে হচ্ছে তা আমার অন্তরে গেঁথে আছে।

যৌবনকালই কাজের শ্রেষ্ঠ সময়

প্রকৃত ও কার্যকর জীবন হচ্ছে যৌবনকাল।কেননা,এ কালটিই অর্জন ও কর্মের বিস্তৃত ময়দান,দান ও উদ্ভাবনের বিশাল ক্ষেত্র। এ সময় শক্তি থাকে পরিপূর্ণ,মনোবল থাকে সুউচ্চ।আর অসুস্থতা,দুর্বলতা বা কোনো প্রতিবন্ধকতা——তা তো এ বয়সের ধর্ম নয়।প্রসিদ্ধ ইমাম ও তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.—— তিনিও ছিলেন এক মহান তাবেয়ী,তিনি বলেন,

يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب،
فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب.

‘হে যুব সম্প্রদায়! যৌবন থাকা অবস্থায় তোমরা নিজেদের থেকে কাজ আদায় করে নাও।

কেননা,আমি তো শুধু যুবকদেরকেই কর্মমুখর দেখতে পাই।’

মালেক বিন দীনার বলেন,সব মঙ্গল যৌবনকালেই।

যামাখশারী রহ. তার আল-কালিমুন নাওয়াবিগ গ্রন্থে বলেছেন, ব্যক্তির জীবনের সূচনাটাই চার সারা জীবনের শিরোনাম।’

ইমাম নববী রহ. তার বৃহৎ গ্রন্থ ‘আল মাজমূ’- এর ভূমিকায় লিখেছেন——

وينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط،وحال الشباب وقوة البدن،ونباهة الخاطر،وقلة الشواغل،قبل عوارض البطالة.

‘প্রত্যেক জ্ঞানন্বেষীর কর্তব্য হলো,তারুণ্য ও যৌবনে ইলম অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা-যখন তার মাঝে উদ্যম,দেহে শক্তি এবং অন্তরে সচেতনতা থাকে।আর সে বাড়তি ব্যস্ততা ও ঝামেলা থেকে একেবারেই মুক্ত এবং বার্ধক্য ও অক্ষমতার আক্রমণ থেকে বহু দূরুত্বে অবস্থান করে।’

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে জামাআ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহ. তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘তাযকিরাতুস সামি’ওয়াল মুতাকাল্লিম ফী আদাবিল আলিমি ওয়াল

মুতাআল্লিম'-এ লিখেন—যৌবন ও জীবনের শুরুটাকে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য দ্রুত বেছে নেওয়া।'করবো' বা 'ইচ্ছে আছে' জাতীয় কথাবার্তার ধোকায় পড়া যাবে না।কারণ,জীবনের যে সময়টা চলে যাবে,তার কোনো বিকল্প নেই।ইলম অর্জনে সচেষ্ট থাকা,চেষ্টা সাধনা করে যেসব ঝামেলা বাধা হয়ে দাড়ায়,সেগুলো যথাসম্ভব দুর করার চেষ্টা করবে। কারণ,এগুলো ডাকাতের মতো অনিষ্টকর।

এ কারণে পূর্ববর্তি মনিষীরা পরিবার থেকে ও নিজ মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকতে চাইতেন।কেননা চিন্তাশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে সূক্ষ্মতত্ত্ব ও দুর্বোধ্য জটিল বিষয় অনুধাবনে মানুষ অক্ষম হয়ে পড়ে। এ কারণে বলা হয়,ইলম তোমাকে কিণ্চিত ও দিবে না,যদি তুমি তাকে পুরোটাই না দাও।

শাফেয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন আবৃত্তি করতেন——

تعلـم يـــا فــتى والعـــــود رطـــب

وطينــــك لـــــبن والطبــــع قابـــل

'হে যুবক,জ্ঞান অর্জন করো। তোমার শাখাটা যখন তাজা থাকে,মাটি নরম থাকে, মন-মানসিকতা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী থাকে'

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

{الله الَّذِي خَلقكُم مِنْ ضَعفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ قوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾}

'আল্লাহ,যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শত্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সময় সদ্ব্যবহারের উপায়

সময় মানুষের সবচেয়ে মুল্যবান মূলধন ও অমুল্য সম্পদ।কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—-মানুষ যেভাবে নির্দয়ে, বেপরোয়াভাবে ও বিনা চিন্তায় সময় নষ্ট করে,নিজ মালিকানার অন্য কোনে বস্তু এত নির্দয়ে ও উদাসীনতার সাথে হাত থেকে যেতে দেয় না।

সময়ের সদ্ব্যবহার,অপচয় থেকে বাঁচানো এবং এ থেকে পরিপূর্ণ মাত্রার উপকার প্রসঙ্গে সময় নিয়ে গবেষণাকারীরা কতিপয় উপায় ও নিয়ম নির্ধারণ করেছেন। নীচে আমরা সেগুলো থেকে তিনটি প্রধান নিয়ম উল্লেখ করছি।

রুটিন

দিন রাতের সময়ের জন্য একটি সময়সূচী নির্ধারণ করা, ভবিষ্যতের সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট কাজের প্রোগ্রাম তৈরী করা এবং জীবনের সমস্ত সময়ের জন্য কাজসমূহের বিন্যাস ও সাজানোকে বলা হয় রুটিন। প্রতিটি মানুষের দায়িত্বে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার ভার থাকে। সে সকল কাজ আদায় করে দায়মুক্ত হবার সহজ,সচ্ছন্দ ও উত্তম উপায় হলো এই যে,মানুষ প্রথম থেকে একটি রুটিন তৈরী করবে এবং তা মেনে চলবে। রুটিন তৈরী করার সময় কাজের আগপিছ নির্ধারণে সময় ও কাজ উভয়ের ধরন ও প্রকার লক্ষ রাখতে হবে। দেখতে হবে কোন্ কাজ কোন্ সময়ে উত্তম ও সহজ উপায়ে সম্পন্ন হতে পারে এবং কোন্ সময় কোন্ কাজের জন্য বেশী অনুকূল পরিবেশ দান করবে। যে কাজ অধিক উদ্যম,মনের সজীবতা ও মন মস্তিষ্কের

আকর্ষণ দাবী করে তা সম্পন্ন করার জন্য এমন সময়ই নির্বাচন করা প্রয়োজন যখন মানুষের মনে সজীবতা ও তেজ থাকে।উদাহরণসরূপ,সকালে মানুষের শক্তি ও কর্মক্ষমতায় সজীবতা ও সতেজতা থাকে। এ কারণেই রাসুলাল্লাহ (সাঃ) নিজ উম্মতের জন্য সকালের সময়ে বরকতের দুয়া করেছেন।ইমাম তিরমিজী (রহঃ) হজরত নবী করীম (সাঃ) এর বাণী উদ্ধৃত করেছেন——

“হে আল্লাহ,তুমি আমার উম্মতের জন্য সকালের সময়ে বরকত দান করো।”

একদিন হযরত নবী করীম (সাঃ) সকালবেলা হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট গিয়ে দেখলেন যে,তিনি শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।হযরত নবী করীম (সাঃ) তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন——“কন্যা, উঠ, নিজ প্রভুর রিযিক বন্টনের সময় উপস্থিত থাকো এবং গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।কেননা আল্লাহ তাআলা প্রভাতের উদয় ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তি সময়ে লোকদের রিযিক বন্টন করেন।”

জীবনকে রুটিনের অধীন করায় প্রচুর উপকার রয়েছে। একটি প্রধান উপকার হলো এই যে, যখন পূর্ব থেকে একটি প্রোগ্রাম নির্ধারিত থাকবে এবং আসন্ন সময়ের জন্য একটি কর্মসূচী নির্ধারিত থাকবে,তখন সময় এলে মানুষের মনোযোগ এমনিতেই তা সম্পন্ন করার প্রতি আকৃষ্ট হবে।আর এতে করে ইতস্ততঃ ও চিন্তাভাবনায় সময় নষ্ট হবে না।বলা হয়ে থাকে——সময় হলো জালেম পিশাচের মতো। জ্ঞানী সে—ই,যে তাকে ধরে আয়ত্তে রাখে। কিন্তু তার চুলের খোপা পিছনের দিকে নয়,সামনের দিকে।তাই তাকে সেই ধরতে

সক্ষম হয় যে দূবদর্শী এবং আসন্ন সময়কে বাঁচানোর জন্য পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে রাখে। দূরদর্শীতার দাবী হলো পূর্ব থেকে একটি রুটিন তৈরী করা এবং জীবনকে তার অধীনে চালানো।

রুটিনের আরেকটি উপকার হলো এই যে,এর কারণে প্রতিটি কাজ যথাসময়ে পুরোপুরি একাগ্রতার সাথে সম্পাদন করা যায়। নইলে সাধারণতঃ এই হয়ে থাকে যে,যখন কোন মানুষের দায়িত্বে অনেক কাজ থাকে এবং সেগুলোর জন্য কোনো রুটিন থাকে না,তখন একটি কাজ করার সময় মন অন্য কাজে আটকে থাকে। এভাবে মানুষের মন তার অজান্তেই একটা অস্থিরতার শিকার হয়।

ইতিহাসে যত জ্ঞানী ব্যাক্তিত্ব অতীত হয়েছেন,যারা বিশাল আকারে গ্রন্থ রচনার খেদমত করেছেন,তাদের সময়ানুবর্তিতা প্রবাদ হয়ে রয়েছে। এটিই তাদের কীর্তির প্রধান রহস্য। তাদের সময়ানুবর্তিতা কেমন ছিলো,তাদের সম্পাদিত যেসব ঘটনাবলী উল্লেখ করা হবে তা থেকে কিছুটা অনুমান করা যাবে।

ইবনে সুকাইনার কাছে সময়ের মুল্য

ইবনে সুকাইনা রহ.এর জীবনি আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়,তিনি ছিলেন সে যুগের ফকীহ ও মুহাদ্দীস এবং সে যুগের বিশেষত আলেমদের জন্য আদর্শ ও নমুনা।তিনি জন্মগ্রহন করেন ৫১৯ হিজরীতে এবং ৬০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহ তাকে দীর্ঘ জীবন এবং ব্যাপ্ত যশ-খ্যাতি দান করেছিলেন।ফলে দূর-দূরান্ত থেকে তালিবে ইলমরা তাঁর কাছে আসতো।দীর্ঘায়ুর সুবাদে তিনি তার বর্ণিত সকল হাদীস বহুবার বর্ণনা করার এবং এর মাধ্যমে বহু হাদীস পিপাসুকে পরিতৃপ্ত করার সুযোগ পেয়েছেন। সময়ের হেফাযতের প্রতি অতি যত্নবান ছিলেন এবং খুব হিসাব করে কথা বলতেন। যেন অনর্থক কথায় সময় নষ্ট না হয়। দিন-রাত তার সময় কাটতো কোরআন তেলাওয়াতে কিংবা যিকির তাহাজ্জুদে অথবা কুরআন ও হাদীস শ্রবণে ও দারস প্রদানে।তাঁর মজলিসে অনর্থক ও অহেতুক কথাবার্তা,গীবত-শেকায়েত নিষিদ্ধ ছিল।নামাজের জামাতে অথবা কারও জানাযায় শরীক হওয়া ছাড়া তিনি কখোনো বাইরে বের হতেন না।দেখা সাক্ষাত কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষেও তিনি কোনো বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালীদের ঘরে বা মজলিসে উপস্থিত হতেন না।

ইমাম নববীর অসাধারণ কীর্তি

পিঠ মাটিতে লাগেনি যার দুই বছর

ইমাম নববী।একজন কিংবদন্তি।তিনি শায়খুল ইসলাম ও আলামুল আওলিয়া উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

হাওরান এলাকার নাওয়া নামক জনপদে তিনি ৬৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহন করেন।১৮ বছর বয়সে ৬৪৯ হিজরীতে তিনি দামেস্কে আগমন করেন এবং

মাদরাসায়ে রাওয়াহিয়্যায় অবস্থান গ্রহন করেন।সুদীর্ঘকাল মাদরাসা প্রদত্ত রুটিই ছিলো তাঁর একমাত্র আহার।

হাফেজ যাহাবী তার 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে ইমাম নববী রহ.-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, ইমাম নববী রহ. বলতেন,'প্রায় দুই বছর আমার এভাবে কেটেছে যে, আমার পিঠ বিছানায় লাগেনি।'

তিনি তখনকার সাড়ে চার মাসে 'আত-তামবীহ' মুখস্থ করেছেন আর বাকী সময়ে 'আল-মুহাযযাব' গ্রন্থের এক চতুর্থাংশ পড়েছেন এবং মুখস্থ করেছেন তাঁর শায়খ ইসহাক বিন আহমাদ রহ.- এর কাছে।

প্রতিদিন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বারোটি দারস গ্রহণ করতেন।তিনি তার উস্তাযগনের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ উলুমুল ফিকহে 'আল-ওয়াসীত' গ্রন্থ থেকে দুই দারস, ফিকহে 'আল-মুহাযযাব' থেকে এক দারস, 'আল-জামউ বাইনাস সহীহাইন' থেকে উলুমুল হাদীস বিষয়ে এক দারস,এছাড়া 'সহীহ মুসলিম' থেকে,আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইবনে জিন্নি'র 'আল-লুমা' গ্রন্থ থেকে,ভাষা শাস্ত্রে 'ইসলাহুল মানতিক' থেকে, সরফ শাস্ত্র থেকে,কখোনো বা ফখরুদ্দীন রাযী-এর 'আল-মুনতাখাব' থেকে 'আসমাউর রিযাল' থেকে উসূলে দ্বীন থেকে, এবং নাহুশাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র একটি করে দারস গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন——-'আমার এ সকল দরসের সাথে সম্পৃক্ত যত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও আলোচনা-পর্যলোচনা থাকতো সব আমি নোট করে রাখতাম।আল্লাহ তাআলা আমার সময়ে বরকত দিতেন।

আবুল হাসান ইবনুল আত্তার আরও বলেন—-

আমাদের শায়েখ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতেন না।দিনে বা রাতে, সব সময়ই তিনি পড়ালেখায় মগ্ন থাকতেন। এমনকি পথ চলার সময়ও তিনি হয় একাকী অধ্যয়ন করতেন অথবা কারও সাথে ইলমী আলোচনা করতেন।এটাকে তিনি প্রায় অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছিলেন।এ অবস্থায় প্রায় ছ'বছর কাটিয়েছেন।এরপর তিনি গ্রন্থ্ রচনা, অধ্যাপনা ও ওয়াজ-নসীহতের পথে অগ্রসর হলেন।তখনও তিনি এমনভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টায় কেবল এশার পর এক বেলা খাবার গ্রহণ করতেন এবং সাহরির সময় তরল কিছু পান করে নিতেন।আড়ম্বরপূর্ণ খাবার কিংবা ফলমূল তিনি খেতেন না। বলতেন—এতে দেহে অলসতা ঠাঁই পাবে এবং ঘুম বেশি হবে।

তিনি ৬৭৬ হিজরিতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।এই অল্প সময়ের জীবন সত্বেও তিনি স্বরচিত বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার রেখে যান।পরবর্তী সময়ে তাঁর রচিত কিতাবের পাতা ও জীবনকালের হিসাব করে দেখা গেছে,গড়ে তিনি প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পন্চাশ পাতা করে লিখে গেছেন।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে তাইমিয়্যার সময়ের মূল্যায়ন

উপরোক্ত সবগুলো ঘটনার চেয়ে বিস্ময়কর হলো শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা আল-হাররানী দামেশকী হাম্বলী রহ. এর অবস্থা। তিনি ৬৬১ হিজরিতে জন্মগ্রহন করেন এবং ৭২৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।তিনি মাত্র

সাতান্ন বছর হায়াত পান।তবে কিতাব রচনা করেছেন পাঁচশ’ জিলদেরও অধিক।এক মুহূর্ত সময়ও তাঁর তা’লীম,গ্রন্থরচনা কিংবা ইবাদত-বন্দেগি ছাড়া কাটতো না।এভাবেই কতো শত খণ্ডের কিতাব লিখে গেছেন—যা তাঁর কোনো ছাত্র বা অনুসারীদের পক্ষে একত্র করাও সম্ভব হয়নি।

তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে শাকির ‘ফুয়াতুল ওয়াফায়াত’ গ্রন্থে লিখেন,ইবনে তাইমিয়্যার গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় তিনশ’।তবে হাফেয যাহাবী রহ. লিখেন এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় পাঁচশ’।

এদিকে তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়িম রহ. তাঁর কিতাবগুলোর নামের একটি সূচি তৈরি করেছেন।যাতে তিনি ২২ পৃষ্ঠাজুড়ে তাঁর প্রায় সাড়ে তিনশ’ কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল কাইয়িম রহ. **الوابل الصيب من الكلم الطيب** গ্রন্থে যিকিরের বহু ফায়েদা ও উপকারিতা উল্লেখ করেন। এর মধ্যে একষট্টিতম ফায়েদা হলো,তা যিকিরকারীকে অলৌকিক এক শক্তি ও ক্ষমতা দান করে। ফলে যিকিরে সময় ব্যয় হওয়া সত্বেও তার দ্বারা এমন এমন কাজ হয় যা অন্য কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এরপর তিনি লিখেন——শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার মধ্যে আমি সেই শক্তি ও ক্ষমতার আশ্চর্যরকম প্রকাশ দেখেছে। আমি তা দেখেছি তাঁর রীতি ও অভ্যাস, আচরণে ও উচ্চারণে এবং সাহসিকতা ও পদক্ষেপ গ্রহণে। আর দেখেছি তাঁর লিখনীতে। তিনি একদিনে যে পরিমানে

লিখতেন তা অনুলিপিকারীর লিখতে লাগতো এক সপ্তাহ কিংবা তার চেয়ে বেশী সময়।

হাফেয ইবনে রজব তার ‘যায়লু তাবাকাতিল হানাবিলা’ গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়্যা রহ.-এর রচনা সম্ভারের ব্যাপারে বলেছেন—— ইবনে তাইমিয়্যা রহ. এতো অধিক পরিমাণে লিখেছেন যে, কোনো মানুষের পক্ষে তাঁর সকল গ্রন্থ পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়।তিনি আরও বলেন,তিনি প্রিয় জীবনের একটি মুহূর্তকেও অহেতুক ব্যয় করতেন না।জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কোন না কোন ফলপ্রসূ কাজে ব্যয় করার প্রতি তিনি এতই গুরুত্ব আরোপ করতেন যে,কখনো কোন কাজে যেতে হলেও তিনি ছাত্রকে বলতেন—-তুমি জোরে জোরে কিতাব পড়,যাতে আমিও শুনতে পাই এবং সময়টা নষ্ট না হয়।

এ হলো মাত্র একজন আলেমের পরিশ্রমের ফসল এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের সুফল।কেউ কেউ তো একথাও বলেছেন যে কোনো মানুষের পক্ষে তারঁ সকল গ্রন্থ পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়।বাস্তবেও এমনই।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

শৈশবে মাতাপিতা উভয়ের স্নেহ থেকে বণ্চিত ‘আহমদ’ সম্পর্কে কে জানত যে, উত্তরকালে এই শিশুই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী নামে গোটা বিশ্বে প্রসিদ্বি লাভ করবে? ইসলামী শাস্ত্রসমূহের বিশেষ করে ইলমে হাদীসের অন্যতম সেবক হবে এবং উম্মতের পক্ষ থেকে ফরযে কেফায়া আদায়

করার জন্য কুরআন মজীদের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ব গ্রন্হ বুখারী শরীফের এমন অমর ভাষ্য রচনা করবে যার তুলনা তা নিজেই।

তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণিত আছে, তিনি প্রথমবার যখন মক্কায় যান তখন জমজমের পানি পান করার সময় দুআ করেছিলেন: ‘হে আল্লাহ, আমাকে হাফেয যাহাবীর মত স্মৃতিশক্তি দান করো’।দুআ কবুল হলো। বিশ বছর পর পুনরায় হাজির হয়ে দুআ করলেন: ‘হে আল্লাহ, আমাকে আরো মেধা দান করো। পরবর্তী কালের উলামায়ে কেরামের ধারনা, হাফেয ইবনে হাজারকে আল্লাহ তাআলা হাফেয যাহাবীর চেয়েও বেশী স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন।

মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি কুরআন মজীদের হিফজ সম্পন্ন করেন।অতঃপর হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ করেন।একাধারে দশ বছর যাবত হাফেজ জয়নুদ্দীন ইরাকীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। এছাড়া ইসলামী জাহানের ইলমী কেন্দ্রসমূহ যেমন মাদীনা,এডেন, ইয়ামান, শাম,গাযা,রামাল্লা,বায়তুল মুকাদ্দাস, দামেশক ইত্যাদি এলাকা সফর করেন।অতঃপর মিসর এসে তিনি দরস—তাদরীস ও গ্রন্থ রচনায় লিপ্ত হন।এখান থেকেই তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।প্রশাসন ও আলেম উভয় পক্ষ থেকে পীড়াপীড়ির কারণে বাধ্য হয়ে তিনি বিচারকের পদ গ্রহণ করেন।সর্বমোট একুশ বছর যাবত তিনি কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সময়ের মূল্য ও তার কল্যাণ

দ্রতপঠন,সময়ের মূল্যদানের বরকত অথবা উভয়টির ফল ছিল এই যে, হাফেয ইবনে হাজার একবার জোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়ের দশ বৈঠকে বুখারী শরীফ খতম করেন।মুসলিম শরীফ আড়াই দিনে এবং তাবরানীর মু’জামে সদীরের দেড় হাজার হাদীস সনদ সহকারে জোহর ও আসরের মাঝখানের সময়ে মাত্র এক বৈঠকে পাঠ করেন।

বস্তুতঃ তিনি নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মেপে মেপে ব্যয় করেন।একটি মুহূর্তও তিনি অহেতুক ব্যয় করতেন না। ফলে তিনি প্রায় দেড় শতাধিক রচনা রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।এতদসত্ত্বেও তাঁর মধ্যেও এমন বিনয় ছিল যে, তিনি বলেন—আমার সকল রচনা অন্য মনীষীর একটি কিতাবেরও সমান নয়।

সারকথা——সময়কে অনর্থক কাজে ব্যয় করা যাবে না।প্রতিটি সেকেণ্ড,প্রতিটি মিনিট প্রতিটি মুহূর্ত যেন উপকারী ও ফলদায়ক কর্ম ও কীর্তি দিয়ে পূর্ণ থাকে সেই দিকে লক্ষ রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

শরীরের যত্ন

মানব শরীরের সুস্থতা আল্লাহ তাআলার অতি মুল্যবান এক নেয়ামত।শরীরের সুস্থতা থাকলেই মন মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে।সুস্থ শরীরেই সময়ের মুল্য দেয়া ও যথাযথ ব্যাবহার সম্ভব হয়। মানুষ যদি রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়,শরীর যদি ক্ষয় হতে থাকে, মনের কুসুম নির্জীব হয়ে যায়, তাহলে জীবনের আনন্দ আর থাকে না এবং পৃথিবীর প্রতিটি দৃশ্যই শুষ্ক মনে হয়। মন সতেজ থাকার নামই জীবন।ভাঙ্গা মনে বুলবুলের মিষ্টি সুরও মনে হয় যেন দুঃখের কান্না এবং ঘুঘুর মধুর গান মনে থাকে বেদনা ও বিরহের বিলাপ। শরীর ও মন উদাস থাকলে ফুলের শোভা এবং বাগান ও বসন্তের সৌন্দর্যও উদাসচিণ্হ হিসাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

মানুষকে আল্লাহ তাআলা যে প্রাণ-মন দান করেছেন, তা আমানতসরূপ। প্রতিটি আমানত হেফাযত করতে হয় এবং তা পরিশোধের তাগিদ দেয়া যুক্তিসংগত ব্যাপার।

হজরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. একদিন শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর পুত্র সেখানে গিয়ে বললেন—— আব্বাজান, আপনি যে ঘুমাচ্ছেন! লোকেরা আপনার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি বললেন—-বৎস! আমার প্রাণটাই হলো আমার বাহন। আমার আশংকা হয় যে,যদি তার উপর অপরিমিত বোঝা চাপাই তাহলে হয়তো সে চলতে অপারগ হয়ে যাবে।

সুতরাং সময় ও জীবন দ্বারা গঠনমূলক কাজ নিতে হলে শারীরিক সুস্থতা রক্ষা ও যত্ন নেয়া এক স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়।

যে কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং সাস্থ্যহানীর আশংকা থাকে তা ভালো নয়। দ্রুতগতিতে চলে রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়া খরগোসের চেয়ে ধীরগতিতে চলা কচ্ছপ,যা গন্তব্যে পৌছে যায় তা সর্বদাই ভালো। কেননা যারা দ্রুতগতিতে চলার গর্ব করে, তারা গন্তব্যে খুব কম পৌছে থাকে। পানির যে ফোটা সর্বদা ঝরতে থাকে,তা কঠিন পাথরের বুকেও সবুজের চিণ্হ সৃষ্টি করে। এই পানির ফোটা স্রোতবিশিষ্ট নদী অপেক্ষা উত্তম যা কয়েক মুহূর্তের আকষ্মিক স্রোতের পরে শেষ হয়ে যাবে।হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন——

“আল্লাহ তাআলার নিকট সেই কাজ সবচেয়ে প্রিয় যা পরিমাণে কম হলেও সর্বদা পালিত হয়।”

হিসাব গ্রহণ

কতটুকু লাভ হয়েছে আর কতটুকু লোকসান,কতটুকু লাভ আর কতটুকু ক্ষতি— তা যাঁচাই করার নামই হিসাব।এ হিসাব ব্যক্তিগত পর্যায়ে হতে পারে।

হিসাব নেয়ার পর অতীত সময় সম্পর্কে যদি গুরুত্ব্রের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাহলে অযথা ব্যয় করা সময়ের জন্য অন্তরে অনুশোচনা আসে। অনুশোচনাই গন্তব্যের পথে চালিত করে।কেননা এতে করে ভবিষ্যতে কোন সময় যাতে অযথা ব্যয় না হয়,সেদিকে সচেতনতা আসে। যদিও এ কথা সঠিক যে,অতীতের জন্য আফসোস ও হারানো বস্তুর জন্য অনুতাপে আরও সময় নষ্ট হয়। তবে তা সে সময় সঠিক যখন সে অনুতাপ ও আফসোস ভবিষ্যতের জন্য কোন নতুন প্রতিজ্ঞা ও প্রেরণার কারণ হয়। হারানো সময়ের জন্য অনুতাপের ফলে যদি পুষিয়ে নেয়ার প্রেরণা ও কাজের উদ্যম সৃষ্টি হয়, তাহলে এ অনুভূতি সময় নষ্ট করা নয়। হিসাব গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার উদ্যম ও কর্মের প্রতিজ্ঞা নতুন করে গ্রহণ করা।

সময় যেভাবে নষ্ট হয়

বেশ কয়েকটি কারণে আমাদের সময়গুলো নষ্ট হয়ে যায়।এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।নতুবা এই কারণগুলো আমাদের জীবনকে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা কোনো পাথেয় সংগ্রহ করতে পারব না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—-

#অন্যমনস্কতা: এটা এমন এক রোগ —যা মানুষের বোধশক্তি ও মননকে আঘাত করে। সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও পরিণামদর্শিতা হারিয়ে ফেলে।কেবল বাহ্যিক ছবি চোখে ভাসতে থাকে;তাত্ত্বিক বিষয়গুলো মাথায় ঢোকে না।চিন্তা মৌলিক কোনো অর্থপূর্ণ বিষয় আসে না।কেবল খোসা নিয়ে ভাবতে থাকে।শ্বাস-মজ্জায় চিন্তা পৌছে না।শুধু শুরু নিয়ে পড়ে থাকে,তারপর কী হবে জানে না।

কুরআনুল কারীমে অন্যমনস্কতা নিয়ে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।বলা হয়েছে,এটা তাদের জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত করবে।আর বানাবে নির্বাক জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও বেশি ভ্রষ্ট।

وَ لَقَدۡ ذَرَاۡنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیۡرًا مِّنَ الۡجِنِّ وَ الۡاِنۡسِ ۫ۖ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ لَّا یَفۡقَهُوۡنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمۡ اَعۡیُنٌ لَّا یُبۡصِرُوۡنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمۡ اٰذَانٌ لَّا یَسۡمَعُوۡنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِکَ کَالۡاَنۡعَامِ بَلۡ هُمۡ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡغٰفِلُوۡنَ

“আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা

তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।”

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলতেন,তিন প্রকারের মানুষের সাহচর্য থেকে সতর্ক থেকো:তোষামোদকারী পাঠক (জ্ঞানী), জ্ঞানবিমুখ মূর্খ সুফি এবং স্বৈরাচারী অন্যমনস্ক।

#ভবিষ্যতের জন্য রাখা:- এখানে আরও বেশি ক্ষতিকর একটি আপদ রয়েছে,যা মানুষকে আজকের দিন এবং বর্তমান থেকে উপকৃত হতে দেয়না।তা হলো—কালক্ষেপন,দীর্ঘসূত্রিতা বা গতিহীনতা।এটা মানুষের চরিত্র ও অভ্যাসের সাথে এ রকম একটি বাক্যকে যুক্ত করে দেয় যে,হুম! আমরা কাজটা করব,অচিরেই করব;বিষয়টা চিন্তায় আছে।

সে যুগের একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোককে বলা হলো,'আমাদের কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন——'তোমরা **سوف** (শীঘ্রই) শব্দ উচ্চারণ থেকে দূরে থেকো (আরবী **سوف** শব্দটি ভবিষ্যতে কোন কাজ করার অর্থ দেয়)।'

আরেকজন বলল—**سوف** হলো ইবলিসের সেনাবাহিনীর এক সৈন্য।

এটা আপনার আজকের দিনের অধিকার।তা উপকারী জ্ঞান অর্জন কিংবা ভালো কোনো কাজে লাগাবে। কোনো কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখবে না।

বর্তমান তোমাকে ফাঁকি দিয়ে অতীত হয়ে যাবে।

আর অতীত কখনো ফিরে আসে না। সুতরাং তোমার আজকের দিনকে কাজে লাগাও—যাতে আগামী দিনে তার ফসল ঘরে তুলতে পারো, নচেৎ তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে; যদিও সে সময় অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না।

ইমাম হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন:-

“কোন কাজ কালকের জন্য ফেলে রেখোনা। আজকের দিনটি তোমার; কালকের দিন তোমার নয়। যদি কালকের দিন তোমার হয়, তাহলে ঠিক একই রকম হওয়া উচিত, যেমন হওয়া উচিত আজকের দিনটি। যদি তুমি কালকের দিনটি না পাও, তাহলে আজকের অবহেলার জন্য তোমাকে আফসোস করতে হবে।’

#গড়িমসির ভয়াবহতা:-

গড়িমসি এবং আজকের কাজকে আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখার অনেকগুলো ভয়াবহ দিক রয়েছে। যথা:

এক. তুমি কাল পর্যন্ত বাঁচবে—এর কোন নিশ্চয়তা নেই। একজন শাসক জনৈক সালেহ ব্যক্তিকে খাবারের টেবিলে আহ্বান করল। তিনি বললেন,’আমি রোজাদার।'শাসক বললেন,’আজ আমাদের সাথে খাও। কাল রোজা রেখ।’তিনি জবাবে বললেন,’আপনি কি আমার কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকা নিশ্চয়তা দিতে পারেন?’

একজন মানুষ কিভাবে অন্য মানুষের জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারে? মৃত্যু তো যেকোনো সময়ে হাজির হয়ে মানুষকে থামিয়ে দেয়।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অনন্য উন্নতির যুগে অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু বেড়েছে বই কমেনি। এই চিকিৎসাশাস্ত্র হার্ট অ্যাটাক, শ্বাসরোধ ইত্যাদি পদ্ধতিতে মৃত্যুর ঠেকানোর কোন ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে পারেনি। কোন প্রযুক্তি সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান তথা গাড়ি-ঘোড়া, উড়োজাহাজ, বৈদ্যুতিক এবং মেকানিজম বিভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা সংঘটিত মৃত্যু প্রতিরোধ করতে পারছে না; বরং প্রযুক্তি সকল নতুন নতুন সমস্যা ডেকে এনেছে। শিল্প বিকাশের আগে মানুষ এ সকল মৃত্যুদূত থেকে নিরাপদ ছিল।

দুই. যদি তুমি আগামীকাল পর্যন্ত জীবনের গ্যারান্টি দিতে না পারো, আকস্মিক কোনো অসুস্থতা,ব্যস্ততা কিংবা বিপদ ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা দিতে না পারো, তবে বুদ্ধিমানের কাজ হল— কল্যাণধর্মী কাজ নিজ দায়িত্বে প্রথম সুযোগে সম্পন্ন করে ফেলা। পক্ষান্তরে অলসতা ও অবহেলা নীরেট বোকামি;যার ফলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।এতে মানুষ হতাশ হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় খুঁজতে থাকে।

কবি বলেছেন,

‘শুধু অলসতায় আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রেখে দিলে!

জেনে রেখো, আগামী দিন শুধু অক্ষমদের দিন।’

তিন. প্রত্যেকটি দিনের কিছু কর্ম থাকে। প্রত্যেকটি সময়ে কিছু নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে আসে। কোন সময়েই কর্মহীন থাকার জন্য নয়।

ইবনে আতা হিকাম গ্রন্থে বলেন,

'সময়ের মাঝে কিছু অধিকার আদায় করা সম্ভব, কিন্তু সময়ের অধিকার আদায় সম্ভব নয়। আল্লাহর কসম! প্রত্যেকটি নতুন সময়ে নতুন কিছু কর্তব্য এবং জরুরি কিছু বিষয় রয়েছে। তাহলে কিভাবে অন্য সময় কর্তব্য সেই সময় আদায় করবে? সেই সময়ে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য গুলো কোথায় যাবে?'

চার.দেরি ও গড়িমসি মানবমনকে ফরজ কাজ এবং নেক আমল ত্যাগে অভ্যস্ত করে তোলে। আর অভ্যাস একবার চেপে বসলে তা স্বভাব হয়ে পড়ে। তা থেকে উত্তরণ খুবই কঠিন। এমনকী মানুষ যদি সময় মত ফরজ কাজ ও নেক আমল করতে মানসিক পরিতৃপ্তি পায় তবে তা করতেই থাকে। সে এই কাজ কেন করছে? তার উদ্দেশ্যই বাকি? সে তা জানে না, কিন্তু এ কাজ ত্যাগ করতে সে কষ্ট অনুভব করে না। সে যখন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তা বাস্তবায়ন করার আগ পর্যন্ত মনে হয় যেন পিঠে একটি পাহাড় নিয়ে হাঁটছে। একইভাবে আমরা দেখি গুনাহ ও পাপাচার থেকে তওবার ক্ষেত্রেও। যার আত্মা পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, প্রবৃত্তির দাসত্বে মগ্ন হয়ে গেছে, তার কাছে পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়া বাচ্চাদের বুকের দুধ ছাড়ানোর চেয়েও কঠিন মনে হয়। প্রতিদিন আসক্তি বেড়ে যায়,আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে; পাপাচারের বহর ও বাড়তে থাকে। এর প্রভাব গুরুতর হতে থাকে,একটা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে। তাপের অন্ধকার তার মূল্যবোধকে

দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেয়।তার কাছে হেদায়াতের আলোকরশ্মি কিংবা সত্যের আলো পৌঁছতে পারে না।

পাঁচ. কর্মই হল জীবিত মানুষের মিশন।যে মানুষ কোন কাজ করে না, তার জীবিত থাকার অধিকার নেই।যতক্ষণ তার মাঝে জীবনের স্পন্দন আছে, ততক্ষণ তাকে কোন না কোন কাজ করতেই হবে; হোক তা দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবী।

কালের প্রতি নিন্দাবাদ: আরেকটি নিষিদ্ধ ও নেতিবাচক কাজ হল যুগকে দোষারোপ করা। সকল কাজে সময়ের জুলুম ও যুগের রুক্ষতাকে দায়ী করা। এমনকি অনেকে মনে করে সময় তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সময় তার চরম শত্রু। সময় তার অগ্রগতিতে প্রধান বাধা। তাদের ধারণা—-সময় হলো কোনো জালিম শাসক যে নিরপরাধকে শাস্তি দিচ্ছে এবং পাপিষ্ঠের পক্ষ অবলম্বন করছে। সময় ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাচ্ছে এবং সে কোন কারণ ছাড়াই এগুলো নিজের খেয়াল খুশিমতো করছে কিংবা রাতকানার মতন এটা— সেটা করেই যাচ্ছে। একবার ঠিক করছে তো দশবার ভুল করছে।

এই ধরনের ভাবনাগুলো জাবরিয়্যাহ দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যারা মানুষ ও সমাজকে দায়মুক্তি দিয়ে পাপাচারের দায় অন্য কিছুর উপর চাপানোর চেষ্টা করে। তারা নিজেদের কর্ম ও ভুলের দায় নিতে অস্বীকার করে; নিজ

কর্মের দায় সময়, ভাগ্য,নসিব, তাকদীর, ব্যস্ততা কিংবা অন্য কিছুর উপর চাপানোর চেষ্টা করে।

কিন্তু তাদের উচিত ছিল সকল বিপদ এবং যে সকল নিয়ামত থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে,তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবা। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে সমস্যার গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করা। সমস্যার কারণের সাথে পরিণতি আর পদক্ষেপের সাথে ফলাফল পাশাপাশি রেখে আল্লাহ নির্ধারিত সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করা। সময় মূলত নিছক ক্রিয়ার আধার। আর সকল ক্রিয়াকান্ড আল্লাহর নির্ধারিত চিরন্তন নিয়ম- নীতি ও সুন্নাত মেনে সংঘটিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সহিহ হাদিসে এসেছেন—-

“তোমরা সময়কে গালি দিও না। কেননা,আল্লাহ নিজেই সময়।(অর্থাৎ, তিনিই সকল রীতিনীতি উদ্ভাবক এবং সঞ্চালক।) মুসলিম:৫৭০১

এ থেকে বুঝা যায় মানুষের উচিত হবে কালকে বা সময়কে দোষারোপ করার আগে, সামাজিক অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার আগে নিজের অবদান মূল্যায়ন করা;নিজের দোষটা দেখা।

এক জ্ঞানী ব্যক্তির কথা ছিল—-

إن الجديدين في طول اختلافهما

لا يفسدان ولاكن نفسد الناس....

‘দুটি নতুনের মাঝে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, তারা ফ্যাসাদ দাঁড় করায় না। ফ্যাসাদ মানুষই দাঁড় করায়।’

“পেরিয়ে যাওয়ার সময়

আসবেনা আর ফিরে”

হে প্রিয় বুদ্ধিমান,বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ভাইয়েরা! আপনার নিজের কল্যাণেই প্রতিটি মুহূর্তকে নষ্ট ও নিষ্ফল হওয়া থেকে হেফাজত করতে হবে। কারণ, আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত হলো একেকটি পাত্র, তাতে যা আপনি রাখবেন তা-ই আপনার জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কবির ভাষায়—-

‘যা গত হয়েছে তা হাতছাড়া হয়েছে, আর ভবিষ্যত তো অদৃশ্য। সুতরাং তোমার জন্য কেমন বর্তমানেই রইল।’

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি কে বলা হলো, দুনিয়ার প্রকৃতি বলুন। তিনি বললেন, গতকাল মৃত দিন, আজ কাজের দিন, আগামীকাল আসার দিন।

ওমর ইবনে যার বলেন, চিন্তা করলে দেখা যাবে, দিন তিন প্রকার। অতীত— যা কখনো ফেরার নয়। বর্তমান— চাইলে আপনি তাকে সদ্ব্যবহার করতে পারেন। ভবিষ্যৎ— আশার দিন। সুতরাং আশা প্রত্যাশা ঘরে বর্তমানকে বিনষ্ট করার বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

শ্রদ্ধেয় উসতাদ মুরশিদ হাসানুল বান্নাহ রহ. বলেছেন-

"من عرف حق الوقت، فقد أدرك الحياة،فالوقت هو الحياة."

“যে সময়ের হক বুঝতে পারলো,সে জীবনকে উপলব্দ্ধি করতে পারলো।কেননা,সময়ই তো জীবন।

ইমাম ইবনুল জাউযী বলেন, জেনে রাখুন! দিন তিন প্রকার। গতকাল, যা পেরিয়ে গেছে। আগামী কাল,হয়তো আপনি তা না-ও পেতে পারেন। আজ, এটাই আপনার দিন। সুতরাং কাজে নেমে পড়ুন। যে নিজের সম্পর্কে সচেতন, সে কতই না ভাগ্যবান!

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ‘গতকাল,সে তো মারা গেছে। আজ, দ্বিধাদ্বন্দ্বে চলে যাচ্ছে। আগামীকাল, এখনো তো জন্মই হয়নি!’

আবু হাযেম সালামা ইবনে দীনার বলেছেন,’দুনিয়া যা চলে গেছে,তা এখন কেবল স্বপ্ন।আর যা অবশিষ্ট আছে,তা কেবলই আশা।’

সময় নবায়িত হয়না এবং ফিরেও আসে না।এ বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত এবং সর্বাবস্থায় মনে রাখা দরকার। এতে সময়ের হেফাজতের ব্যাপারে উৎসাহ পাওয়া যাবে।

সুতরাং সময়-সম্পদের হেফাজতে তুমি আগ্রহী হও। নিজেকে সুবিন্যস্ত এবং নিজের কাজগুলোকে সুশৃঙ্খল করার মাধ্যমে তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট হও। চাই তুমি ছাত্র হও কিংবা শিক্ষক, পাঠক হও বা লেখক, কিংবা হও

তুমি আবেদ ও সাধক। সময় সম্পদকে নষ্ট ও অপচয় করে তুমি নিজের প্রতি জুলুম করো না। প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তকে বধ করে তুমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিও না, অলসতা ও আরাম-আয়েশে আসক্ত হয়ে নিজের সাথে প্রতারণা করো না। মান- মর্যাদা ও উত্তম গুণাবলী থেকে উদাসীন হয়ে জীবনের ক্ষেত্রে আত্মপ্রবঞ্চিত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন আত্মসমালোচনা করতে সক্ষম নয়, তার উচিত কয়েক দিন পরপর করা;অন্ততঃ সপ্তাহে একবার।কেবল আত্মসমালোচনার মাধ্যমে কেউ ভালো করে বুঝতে পারে—-তার প্রাপ্তি কতটুকু,তার দায়িত্বের কী কী বাকি আছে

আর প্রত্যেক মাসের শেষে লম্বা সময় নিয়ে বসে আত্মসমালোচনা করতে হবে।প্রত্যেক বছর বিদায় জানানো এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর সময় বেশি বেশি বিশ্লেষণমূলক আত্মসমালোচনা করতে হবে।বিগত বছর যা কিছু হারিয়েছে, তার যথার্থ পর্যালোচনা এবং যা কিছু পেয়েছে,তার উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।; ঠিক ব্যবসায়ীদের বার্ষিক হালখাতা মতো।

Happy new year কিংবা happy birthday পশ্চিমাদের একটি নতুন আবিষ্কার! দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমদের একটি অংশ আজ এটা অনুসরণ করছে।

তাদের জীবন থেকে প্রতিটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁরা একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেসেখানে সুস্বাদু এবং উন্নত খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মানুষ আজকাল পশ্চিমাদের ও আচার-আচরণগুলোতে অভ্যস্ত হয় পড়ছে। তারা সাল গণনার এই সময়টিতে মোমবাতি প্রজ্জলন করছে এবং নাটকীয় কায়দায় তা নিভিয়ে ফেলছে।জন্মদিনের এই সময়টাতে শুভেচ্ছা ও উপহার বিনিময় করছে। এটা অন্ধ অনুসরণ;যার কোনো অর্থ কিংবা উপকারিতা নেই।একজন বুদ্ধিমান মানুষের উচিত হবে, জীবনের একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এই সুযোগটার সদ্ববহার করা।জীবনটাকে সুন্দর পরিপাটি করে গুছিয়ে নেওয়ার নিমিত্তে হিসাব-নিকাশে সময় দেওয়া এবং সুস্থ মাথায় চিন্তা-ভাবনা করা; ঠিক জাত ব্যবসায়ীর মতো। একজন জাত ব্যবসায়ী বছর শেষে হিসাব-নিকাশ নিয়ে বসে। হিসাবের খাতা খুলে মজুদ পণ্যগুলোর হিসাব করে এবং ঋণের পরিমাণটা দেখে নেয়—-যাতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে,তার কী দেনা-পাওনা আছে।সে কতটুকু লাভ করেছে,আর কতটুকু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

তার উচিত হবে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ধরনা দেওয়া,যেন আজকের দিন গতকালের চেয়ে ভালো হয়। আর আগামী দিন হয় আজকের চেয়েও উন্নত।

একজন বুদ্ধিমান মানুষের উচিত,জীবন থেকে খসে পড়া পূর্ণ একটি বছরে নিজের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করা; যার ব্যাপারে আল্লাহ অচিরেই তাকে জিজ্ঞাসা করবেন।আর এটা মোটেই কম সময় নয়।পুরো একটি বছর!! অর্থাৎ,১২ মাস। প্রতি মাসে ৩০ দিন।দিনে ২৪ ঘণ্টা। ঘণ্টায় ৬০ মিনিট। মিনিটে ৬০ সেকেণ্ড। আর প্রতিটি সেকেণ্ডই আল্লাহর কিছু নিয়ামত রয়েছে;প্রতিটি সেকেণ্ডই তাঁর পক্ষ থেকে আমানত।

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের উচিত হবে জীবন থেকে হেলায় হারিয়ে যাওয়া সময় নিয়ে আফসোস করা।অতিবাহিত প্রতিটি দিন জীবনবৃক্ষের ঝরে পড়া একেকটি পাতা।

আল্লাহ হাসান বসরির উপর রহম করুন। তিনি বলেছেন———

‘হে আদম সন্তান! তুমি কিছুদিনের সমষ্টি। যখনই একটি দিন চলে যায়,তোমার একটি অংশ হারিয়ে যায়।’

আমি জানি, আমি একদিন থাকবো না এই পৃথিবীতে। বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম কত বৎসর। তবে মৃত্যু অবধারিত। শেষ গন্তব্য তো মাটি। যে আত্মা নিতে আসবে জানি না কেমন লাগবে দেখে! কালো কাপড় পড়া বিরাট কুৎসিত কোন কেউ? তাকে দেখে হয়তো ভয়ে ছটফট করবো, হাত-পা ভারী হয়ে যাবে, কথা আটকে যাবে, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরবে, হয়তো আরও ৭০ গুণ ভয়ানক কিছু হতে পারে, আমার ভয়ার্ত চিৎকার আর কারো

কানে পৌছবে না তখন। এভাবে যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে আমার মৃত্যু হবে।

গোসল করানোর পর সাদা কাফনে জড়িয়ে যেতে হবে, হয়তো নাকে তুলো গুঁজা থাকবে। কবরস্থানের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে, জানাজা হবে, কবর আগেই খোঁড়া থাকবে সাড়ে তিন হাত। শুইয়ে দেবে কবরে, তারপর আমার উপরে বাঁশের কয়েকটি ফলা বিছিয়ে দেয়া হবে, তার উপর কলাপাতা আর মুঠোয় মুঠোয় মাটি পড়তে থাকবে কাফনের কাপড় বেয়ে আমার শরীরে। মাটি দেয়া শেষে সবাই চলে যাবে, হয়তো ২-১ দিন এসে কাঁদবে কবরের পাশে। তারপর কেউ দেখতে আসবে না। আমি একদম একা, নিঃসঙ্গ।দিন, মাস, বছর পেরিয়ে কবরে ঘাস গজাবে, একদিন আমার উপরেই হয়তো দেওয়া হবে নতুন আরেকটি কবর, নতুন লাশ... এভাবেই মিলিয়ে যাবে সবকিছু। কিন্তু আমি কেয়ামতের আগ পর্যন্ত শুয়ে থাকবো সেই দরজা - জানালাবিহীন বদ্ধ সেই কবরে।

মৃত্যু-চেষ্টা সাধনার সময় শেষ হওয়ার সর্বশেষ ঘোষণা। আর পরকাল -নিজের চেষ্টাসমূহের ফলাফল লাভের শেষ জায়গা। মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার চেষ্টা-সাধনার না কোন সুযোগ রয়েছে, না রয়েছে পরকালীন জীবন শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা। কতই না কঠিন এ বাস্তবতা। যদি মানুষ মৃত্যুর পূর্বে এ ব্যাপারে সজাগ হত! কারণ, মৃত্যুর পরে এ ব্যাপারটি বুঝে আসলে তখন আর কিছুই করার থাকবে না। মৃত্যুর পর সতর্ক হওয়ার অর্থ তো শুধু এই

যে, মানুষ কেবল এই বলে আফসোস করে করে সময় কাটাবে যে, সে অতীতে কত বড় ভুলই না করেছে।এমন এক ভুল যা শুধরানোর সামান্যতম সুযোগ তার সামনে নেই।

মানুষ তার পরিনাম সম্পর্কে গাফেল। পক্ষান্তরে কালস্রোত তাকে অতি দ্রুত ওই সময়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যখন ফসল কাটার লগ্ন চলে আসবে। মানুষ এ পৃথিবীর তুচ্ছ ফায়দাসমূহ অর্জনের জন্য ব্যস্ত রয়েছে এবং মনে করছে, সে কাজ করছে প্রচুর। পক্ষান্তরে সে কেবল তার মূল্যবান সময়ই নষ্ট করে যাচ্ছে। মানুষের সামনে বিরাট সুযোগ রয়েছে, যা ব্যবহার করে সে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে পারে। কিন্তু মানুষ কাদামাটি নিয়ে খেলছে। তার প্রভু তাকে স্বর্গের দিকে ডাকছেন যা কল্পনাতীত নিয়মিত সামগ্রীতে ভরপুর, কিন্তু মানুষ কয়দিনের মিথ্যা আয়েশে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছে। মানুষ মনে করছে, সে লাভ করছে, কিন্তু মূলত সে কেবলই হারাচ্ছে। দুনিয়াতে বাড়ি বানিয়ে সে মনে করছে সে জীবন গড়ছে কিন্তু আসলে সে বালির দেয়াল দাঁড় করাচ্ছে যা কেবল কিছুক্ষণ পর ধ্বসে পড়ার জন্যই দাঁড়াচ্ছে।

মানুষের ভিতরে দু ধরনের মত কাজ করে। এক মত যা মানুষকে ভালো কাজ করার নির্দেশ দেয় আর অপরটি খারাপ কাজের। মানুষ যে কোন একটিকে কাজে লাগিয়ে অনেক ভালো অথবা খারাপ হয়ে বেঁচে থাকে। যখন সে মারা যায় এই ভালো আর খারাপ কাজের ফলশ্রুতি হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাকে মনে রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة}

তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।”

একজন সাধারণ পাঠক এ আয়াতে কোন বিশেষ কিছু কিংবা স্বতন্ত্র বিষয় দেখতে না-ও পেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই আয়াত মানব সমাজের জন্য একটি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ। এমনকি একজন নাস্তিকও স্বীকার করে যে, আল্লাহর শক্তির কাছে সে অসহায় এবং নিজের মৃত্যুর সময়টাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।অধিকন্তু কোন বিজ্ঞানীই এ পর্যন্ত কারো মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেনি।আমরা জীবন ও মৃত্যুর উপরআল্লাহ তাআলার সার্বভৌম ক্ষমতার অসংখ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ করি।

অনেকেই আছে যারা সাময়িক রোগ-যন্ত্রণায় ভোগে এবং বহু বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আবার অনেকেই এমন আছে যারা সুস্থ জীবন যাপন করে এবং হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করে। অধিকন্তু কারো অসুস্থতা যতই তীব্র হোক না কেন তা কোন ব্যাপার নয়, কোনো চিকিৎসকই কারো মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না। এটি এমন একটি জ্ঞান, যার না এ পর্যন্ত কেউ অর্জন করতে পেরেছে, আর না অর্জন করতে পারে। কারো মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন।

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন,

প্রতিদিন যখন প্রভাত উদিত হয় তখন সে আহবান করে বলে,” হে আদম সন্তান, আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং তোমার কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় গ্রহণে বর্তী হও। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত আমি আর কখনো ফিরে আসবো না।

বরাবরই ইসলাম সময়ের গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়ে থাকে।ইসলাম এই অমূল্য বাণীটিকে সমর্থন করে—-‘সময় তরবারির মতো, তুমি যদি তাকে না কাটো তাহলে সে তোমাকে কেটে দিবে।’ এ বাস্তবতাটা অনুধাবন করা ও এর নির্দেশনা অনুযায়ী চলা ঈমানের প্রমাণ ও তাকওয়া নিদর্শন।

ইসলাম তার অনেক নির্দেশাবলী নিষেধাজ্ঞাসমূহ সময়ের মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। ইসলাম যখন অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকাকে ঈমানের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছে, তখন বেকার ও উদাসীন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। যারা একে অপরকে ডাকে আর বলে,এসো! একটু আনন্দ- ফুর্তিতে সময় কাটাই।’ অথচ এই বোকার দল জানে না—- এটা জীবন নিয়ে খেলা করার নামান্তর। এভাবে সময় কাটানো ব্যক্তিকে ধ্বংস করে এবং সমাজকে নষ্ট করে।

বুদ্ধিদীপ্ত সেই কথাটি আজ মানুষ ভুলে যেতে বসেছে——

الواجبات أكثر من الأوقات الزمن لا يقف محايداً فهو إما صديقٌ ودود أو عدوٌ لدود

‘সময়ের তুলনায় কাজ অনেক বেশি। সময় নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকে না। সে হয়তো খাঁটি বন্ধু নয়তো ভয়ানক শত্রু।’

প্রজ্ঞাদীপ্ত এই কথামালা ইসলামের অন্তর্নির্হিত উৎস থেকে নির্গত এবং ইহকাল থেকে পরকালের বৃহৎ জীবনে জন্য উপকার লাভ করার ব্যাপারে ইসলামের মহান শিক্ষার ঝলক। বান্দার অন্তরে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত

কাজে লাগানো ও এক প্রচেষ্টা থেকে আরেক প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া আল্লাহর বিশেষ দান ও তার তৌফিকের প্রমাণ। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক—- সাধারণ মানুষ তাদের সময়গুলো অনর্থক কাজে নষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করেনা এবং এই অপরাধের সাথে আরেকটি অপরাধ করে থাকে—- তাহলো অন্যের সময়ের উপর আক্রমণ করে সেগুলোকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়।তারা কর্মপ্রিয় লোকদের কাছে তাদের একান্ত কাজের সময়ে তাদেরকে মূল্যহীন কাজে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রবেশ করে।

ইসলাম যে সময় সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এর আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, ইসলাম সকাল সকাল কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। ইসলাম চায়—— প্রতিটি মুসলিম তার দ্বীনের কাজগুলো শুরু করুক পূর্ণ উদ্যম ও আগ্রহের সাথে, পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে। কেননা, দিনের প্রথমভাগ দ্বারা উপকৃত হওয়ার আগ্রহ বাকি দিনটা বেকার নষ্ট না করার প্রচন্ড আগ্রহ জন্ম দিবে।

মর্যাদাবান সময় অনুসন্ধান

পরিশেষে,একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের উচিত হবে যে,কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। কিছু সময়কে অন্য সময়ের ওপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।এ সময়গুলো আধ্যাত্মিক শক্তি অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি।এ সময়ে নেক কাজ তাকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখবে।

*আল্লাহ তাআলা রাতের শেষ তিন ভাগের একভাগ তথা সেহরির অংশকে মর্যাদাবান করেছেন। এ সময় তিনি প্রতি রাতে বান্দাদের নিকট আত্মপ্রকাশ

করেন এবং স্বীয় মহিমাময় পদ্ধতিতে তাদের কাছে নেমে আসেন।আর ঘোষণা করেন——-

‘হে আমার বান্দারা!তোমাদের মধ্যে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে? আমি তাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক। কোনো তাওবাকারী আছে? আমি তার তাওবা কবুল করবো। কোনো সাহায্যপ্রার্থী আছে? কোনো আহবানকারী আছে?’ তিনি এভাবেই ফজর পর্যন্ত ডাকেন।

*সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে তিনি জুমার দিনকে মর্যাদাবান করেছেন।এই দিনটি মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদ। এতে রয়েছে জুমার সালাত,রয়েছে জুমআ উপলক্ষ্যে মিলনমেলা।আর এতে রয়েছে এমন একটি সময়, যে সময়ে মুসলিমরা আল্লাহর কাছে কল্যাণকর কিছু চাইলে তিনি তা তে সাড়া দেন।

*আল্লাহ তাআলা বছরের দিনগুলোর মধ্যে জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০জিনকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন।এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী আরাফার দিন। বলা যায়,এটা সারা বছরের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন। ইবনে আব্বাসের সূত্রে রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে——‘আল্লাহর কাছে এই দিনগুলোতে (আশুরার ১০ দিন) নেক আমলের চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয় কোনো আমল নাই।সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন—-“হে আল্লাহর রাসুল!আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়? তিনি বলেন—-“আল্লাহর পথে জিহাদও নয়।তবে যে তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে জিহাদে বের হলো এবং ফিরে এলো না তার কথা ভিন্ন।

*বছরের মাসগুলোর মাঝ আল্লাহ রমজান মাসকে মর্যাপূর্ণ করেছেন।এই মাসটিতে তিনি মানবজাতির পথনির্দেশ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কুরআন অবর্তীর্ণ করেছেন।সিয়াম ফরজ করেছেন। রাতের সুন্নাত সালাতকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন।অধিক পরিমাণে আমলে সালেহ করাকে করেছেন মুস্তাহাব।সুতরাং এটা ইবাদতের মৌসুম।সৎকর্মশীলদের ব্যবসাক্ষেত্র। জান্নাতের পথের যাত্রীদের প্রতিযোগিতার ময়দান।আমাদের সালাফরা বিপুল উৎসাহ এবং অধীর আগ্রহের সাথে রমজানের প্রতীক্ষায় থাকতেন। তারা রমজানকে স্বাগত জানাতে ‘ পবিত্র ক্ষণ’ শব্দটি ব্যবহার করতেন। তারা এর মাধ্যমে নিজেদের দোষ-ত্রটির আবর্জনা এবং পাপরাশির ময়লা ধুয়ে ফেলতে চাইতেন।আর আল্লাহ তো তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভলোবাসেন।

রমজানের পুরো মাসটাই গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শেষ এক তৃতীয়াংশ বা শেষ ১০ দিন। তার গুরুত্ব দুটো কারণে——

প্রথমত: এটা মাসের শেষ ভাগ।আর শেষ কাজটা সুন্দর হওয়ার বেশি দাবি রাখে।

দ্বিতীয়ত:এটা হলো কদরের সম্ভাবনাময় সে রাত, যে রাতকে আল্লাহ হাজার রাতের চেয়ে উত্তম করেছেন। নবী করিম (সাঃ) যখন রমজানের শেষ ১০ দিনে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি তাঁর কাপড়কে শক্ত করে বাঁধতেন।রাতকে

প্রাণবন্ত করতেন,পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন;আর এ সময়কে ইতেকাফের জন্য বরাদ্দ করতেন।

বুদ্ধিমানের সঞ্চয়

‘আদ তাদরীব ওয়াত-তাকনিয়া’ ‘ম্যাগাজিনে বা বুদ্ধিমানের সঞ্চয় শিরোনামে ডাক্তার আসমা বিনতে মুহাম্মদ বাহরমুজ এর লেখা একটি প্রবন্ধ আছে। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।প্রবন্ধটির গুরুত্ব ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিম্নে তা দেয়া হলো——-

“যদি এমন কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়—-যা প্রতিদিন তোমার একাউন্টে দিনের সেকেন্ডের হিসাব মতো ৮৬৪০০ রিয়াল জমা করে। কিন্তু ব্যাংকের নীতি হলো, দিনশেষে তোমার একাউন্টে যা থেকে যাবে— যা তুমি ব্যবহার করতে পারোনি তা ব্যাংক কেটে নেয়।ব্যাংক তোমাকে অবশিষ্ট মুদ্রাগুলো আরেকদিনের জন্য রেখে দেওয়ার অনুমতি দেয় না এবং তোমাকে আগামী দিনের টাকা আজকে তুলে নেওয়ারও অনুমতি দেয় না। তাহলে তুমি কি করবে? অবশ্যই প্রতিদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই তোমার একাউন্টে থাকা প্রতিটি পয়সা তুমি তুলে নিতে চাইবে!

তোমার কি জানা আছে, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এমন একটি ব্যাংক আছে— সেটা হলো সময়।সে প্রতিদিন ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে তোমাকে ৮৬৪০০ সেকেন্ড দেয়। দিনশেষে যে সেকেন্ডগুলো তুমি কোনো গঠনমূলক ফলদায়ক কাজ ব্যবহার করতে পারোনি সেগুলো হারালো।

একটি বছরের মূল্য জানতে একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করো—
যে পরীক্ষায় ফেল করেছে।
একটি মাসের মূল্য জানতে একজন মাকে জিজ্ঞেস করো—
যিনি অষ্টম মাসে সন্তান প্রসব করে ফেলেছেন।
একটি সপ্তাহের মূল্য জানতে একজন সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক কে জিজ্ঞেস করো।
একটি দিনের মূল্য জানতে একজন দিনমজুরকে জিজ্ঞেস করো—
যে দশটি সন্তান লালন পালন করে।
একটি ঘণ্টার মূল্য জানতে একজন নববধূকে জিজ্ঞেস করো—
যে বাসর রাতে তার স্বামীর অপেক্ষায় থাকে।
একটি মিনিটের মূল্য জানতে একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো—-
যে রেলগাড়ি ফেল করেছে।
একটি সেকেন্ডের মূল্য জানতে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো—
যে অল্পের জন্য সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে।
এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগের মূল্য জানতে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো—
যে অলিম্পিক খেলায় রুপার মেডেল পেয়েছে।

উপরোক্ত কথাগুলো একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ— যা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করি। মুসলমান হিসেবে সময়কে কাজে লাগানোর দায়িত্ব প্রত্যেক মুমিনের উপর।নামাজ থেকে শুরু করে হজ্জ পর্যন্ত আমাদের দায়িত্বগুলো সময় দ্বারা নির্ণিত। আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন— আমাদের একজন কতোবার নিজেকে নিয়ে দিনশেষে বসে এবং তার হিসাব নেয়? কী পরিমাণ সেকেন্ড তার একাউন্টে ওই দিন সকালে জমা রাখা হয়েছিল— যা সে আল্লাহ ও মাখলুকের অসুন্তুষ্টিমূলক কাজে জ্বালিয়ে অঙ্গার করে ফেলেছে।

উপমা হিসেবে বলা যায়— বহুদিন ধরেই আমরা টেকনিক্যাল শিক্ষার নামে কথা বলে আসছি।কি পরিমাণ রাত আপনি ইন্টারনেটের পর্দার সামনে বসে অন্যের সাথে অর্থহীন কথা বলে কাটিয়ে দিয়েছেন, অথচ পরিবারের সঙ্গে কথা বলছি না!

কিভাবে আমরা প্রতিদিন বেপরোয়া হয়ে বিপুল পরিমাণ নতুন সম্পদ হারাচ্ছি—-যা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হওয়ার জন্য দান করেছেন। পরিশেষে এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের প্রত্যেককেই প্রশ্ন করা হবে তার বয়স সম্পর্কে—- কোথায় তা ব্যয় করেছে? তার তারুণ্য সম্পর্কে——কোথায় তা কাজে লাগিয়েছে? তার সম্পদ সম্পর্কে—- কোত্থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে? তার ইলম সম্পর্কে—- কী আমল করেছে?

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী-এর উপদেশ

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী রহ. এর একটি উপদেশ দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি:- তিনি তার উপদেশের শুরুতে বলেছেন,

তুমি নিজের মূল্যবান জীবনটাকে গনিমত মনে করো, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। তোমার প্রিয় জীবনকে হেফাজত করো। মনে রাখবে— তোমার জীবনকাল খুবই সামান্য। পরিমাণ মতো নিঃশ্বাস দেয়া হয়েছে। প্রতিটি শ্বাসই তোমার জীবনের একটা অংশ কেড়ে নেয়। পুরো জীবনটাই স্বল্প—- যা বাকি আছে সেটা খুবই কম।তোমার জীবনের প্রতিটি অংশই একটি মহা মূল্যবান রত্ন—- যার কোন তুলনা নেই, যার কোন বিকল্প নেই। কারণ, এই সামান্য জীবন দ্বারাই অর্জিত জান্নাত বা জাহান্নাম।

জীবনটাকে যদি চিরস্থায়ী জীবনের সাথে তুলনা করো, তাহলে জানতে পারবে—-প্রতিটি শ্বাস চিরস্থায়ী আরামের যুগের হাজার বছরের চেয়েও অধিক সময়ের সমমানের হবে বা তার উল্টা হবে ।

আর যা এমন হয়, তা হয় অমূল্য সম্পদ। সুতরাং তুমি তোমার জীবনের দামি মুক্তাগুলোকে অলসতা করে নষ্ট করো না এবং ধ্বংস করো না বিনিময় ছাড়া।

চেষ্টা করো—- তোমার প্রতিটি শ্বাস যেন কোনো না কোনো ভালো কাজে ব্যয় হয়। তোমার কাছে যদি দুনিয়ার কোন মনিমুক্তা থাকতো, আর সেটা হারিয়ে যেতো তাহলে তুমি অবশ্যই প্রচন্ডভাবে ব্যাথিত হতে। মুক্তা কেন, বরং যদি তোমার একটি সামান্য স্বর্ণমুদ্রাও হারিয়ে যেত তাহলে সেটার জন্য তুমি দুঃখিত হতে। তাহলে তুমি তোমার মুহূর্তগুলো ও সময় গুলো কি করে অবহেলায় নষ্ট করো? কেন অযথা নষ্ট হয়ে যাওয়া জীবনের জন্য তোমার আফসোস হয় না?

"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين "

-————*————-